প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ মুস্তাফা সোহেল হিলালী

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2015 - 1436

IslamHouse.com

﴿الختمات المروجة: حقيقة ودراسة﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ مصطفى سهيل هلالي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2015 - 1436

IslamHouse.com

সূচিপত্র

প্রচলিত বিভিন্ন খতম তাৎপর্য ও পর্যালোচনা

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিনের, যিনি আমাদেরকে তাঁর শ্রেষ্ঠ মাখলুক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত বানিয়েছেন। দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিরস্থায়ী কিতাব আল-কুরআন। এ দুইয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে সর্বদা ও সর্বত্র কার্যকর বিধানের ধারক বাহক বানিয়েছেন। আমাদের উপর মহান আল্লাহর এসব নেয়ামত অপরিসীম। এক নবীর পর যখন আরেক নবী নতুন দীন নিয়ে আসেন, এক কিতাবের পর যখন আরেক কিতাব নতুন কিছু বিধান নিয়ে অবতীর্ন হয়, তখন স্বভাবত উম্মতের মধ্যেই দুই শ্রেণি হয়ে যেতে দেখে যায়। এক শ্রেণি নতুন নবীর উপর ঈমান আনেন, ফলে তারা মুমিনই থাকেন। আরেক শ্রেণি নতুন নবীকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করে বেঈমান বা কাফের হয়ে যায়। আল্লাহর কৃপায় সর্বশেষ নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্যে আমরা এমন পরীক্ষামুক্ত। না নতুন নবী আসবেন, না কোনো নতুন বিধান আসবে। নতুন কোনো দীন বা পদ্ধতির অনুসরণ করব কি করব না এই ঝামেলায় আমাদেরকে কখনো পড়তে হয় না। যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন সেই নবীর উম্মত হতে পারা কতই বড় সোভাগ্যের কথা

তা পূর্বের উম্মতের ইতিহাস নিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে এই বড় নেয়ামত প্রদানের জন্য আবারো তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি।

রাসূল ﷺ এর দীন, তাঁর তরিক্বা, তাঁর আদর্শ প্রচারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে যুগে যুগে একশ্রেণি তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। ফলে ইবাদত সংক্রান্ত যেকোনো খুটিনাটি বিষয়ে রাসূল ﷺ এর আদর্শ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এখন আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র তাঁর রেখে যাওয়া দীনের অনুসরণ। দীন পালনে তাঁর পদ্ধতির অনুসরণ। সালাত, যাকাত, সওম, হজ্জ, তেলাওয়াত দো'আ, দুরূদ, যিকর সর্বক্ষেত্রে তাঁর রেখে যাওয়া পদ্ধতির অনুসরণ অনূকরণই একজন মুমিনের কর্তব্য। এমন কোনো ইবাদত বা নেক আমল নেই যেখানে তাঁর আদর্শ নেই। ইবাদত সংক্রান্ত সব বিষয় বিবেক কর্তৃক নির্ধারণের উর্ধ্বের বিষয়, যা একমাত্র ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়, জ্ঞানের শেষ সীমা থেকেই ওহীর সুচনা, সুতরাং তাঁর আদর্শ, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য যেখানে নেই তা ইবাদত বা নেক আমল বলে গণ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অনেক দিন থেকেই মনে প্রশ্ন ছিল যে, কুরআন তেলাওয়াত একটি নেক আমল, হাদীস চর্চা একটি নেক আমল। অনুরূপ দো'আ, দুরূদ, যিকর সবই নেক আমল। তাই এগুলোর মাঝে পরিবর্তন, পরিবর্ধন,

সংযোজন, বিয়োজন করা, অথবা এগুলোকে রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্য বর্জিত অর্থাৎ তিনি এগুলোকে যে উদ্দেশ্যে করেন নি সে উদ্দেশ্যে করার সুযোগ থাকে কীভাবে? আমাদের সমাজের প্রচলিত 'খতম' কি এর ব্যতিক্রম? খতমের নামে রাসূল ﷺ এর সুন্নাত পদ্ধতির ব্যত্যয় ঘটানো, তিনি যে উদ্দেশ্যে এগুলো করেন নি তা করা কতটুকু সিদ্ধ? আল-হামদু লিল্লাহ, দেখা যায় অনেক প্রজ্ঞাবান আলেম যারা যুক্তির উর্ধ্বে রাসূল ﷺ এর সুন্নাতকে স্থান দেন, পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতের অনুসরণের সর্বদা চেষ্টা করেন, তারা সব সময়ই এসবের বিরোধিতা করে আসছেন। বাংলাদেশে এদের মাঝে অন্যতম বিশিষ্ট মুফতি, সবার কাছেই যার সুন্নাতের পাবন্দির কথা প্রসিদ্ধ, মুফতি ফয়জুল্লাহ রাহ.- আল্লাহ তাকে মাগফেরাত ও রাহমাত দিয়ে ঢেকে নিন- তিনি সর্বদা এসবের কঠোর বিরোধিতা করতেন। তাঁর রচিত কাব্যের কিতাব 'পান্দে নামাহ খাকী'তে প্রচলিত খতম সম্পর্কে একটি পাঠ লিখেছেন, যাতে সর্বপ্রকার খতম বিদ'আত ও সুন্নাহ বহির্ভূত আখ্যা দিয়ে এসব বিদ'আত কুসংস্কার পরিহার করে সুন্নাতকে আকড়ে ধরার নসীহত করেছেন।[1] তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা 'হামিউস্-সুন্নাহ' মেখল, চট্টগ্রামে অধ্যয়ন থেকেই মূলত সুন্নাত এবং সুন্নাতের ধারক

---

[1] মুফতি ফয়জুল্লাহ, পান্দে নামাহ খাকী, মুফতি ইযহারুল ইসলামের ব্যাখ্যাসহ, খতমে শবীনাহ, খতমে বুখারী, খতমে দু'আ ইউনুস এবং অন্যান্য ফাসেদ কুসংস্কার যেমন...আলোচনা, পৃষ্ঠা: ৩১।

আলেমদের প্রতি মহব্বত এবং বিদ‘আতের প্রতি ঘৃণা জন্ম নেয়। আসাতিযায়ে কেরাম সব সময় তাঁর একটি মূল্যবান নসীহত শুনাতেন। নসীহতটি ছিল,

" نیست حجت قول و فعل هیچ پیر * قول حق گو فعل احمد را بگیر"

“কোন পীরের কথা ও কর্ম দলীল নয় * হক্ব বল, আহমদ এর কর্মকে ধর।”

যদিও শয়তানের ধোঁকায় বা না জেনে অনেক সময় সুন্নাত বিরোধি বিদআতি কর্মে লিপ্ত হয়ে যাই। আল্লাহর কাছে তার জন্যে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সুন্নাহ বহির্ভূত এসব খতম পদ্ধতির প্রতি অনীহা থাকা সত্বেও অনেক সময় ঈমানী দুর্বলতা বা পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিজেকে এসবের মধ্যে জড়িয়েছি। জড়িয়ে থাকার কারণে এসবের আরো অনেক না-জায়েয দিক সামনে আসলে দিন দিন এগুলোর প্রতি আরো বেশি অনীহা ও সাধারণ জনগণের অজ্ঞতার উপর আফসোস জন্ম নেয়। সহজভাবে সুন্নাহর পদ্ধতিতে নেক আমল পালন করা ছেড়ে দিয়ে অযথা এসবে লিপ্ত হয়ে নিজের সময়, টাকা পয়সা কেন ব্যয় করি? এতে আমার কী লাভ? আমার অজ্ঞতার কারণে এক গোত্রের দুনিয়াবী কিছু স্বার্থ অর্জন হচ্ছে, এই যা। এই

কি আমার চাওয়া পাওয়া? একে কি আমি একবারও নবীর সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে দেখেছি? আমাদের এসব কর্ম কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখার ইচ্ছা দীর্ঘ দিন থেকে লালন করে আসছিলাম। সর্বশেষ মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র রচনাটি লিখতে সক্ষম হয়েছি। এতে যা কিছু ভাল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা মন্দ সব আমি অধমের। এতে কিছু মানুষের উপকার হলে এটাই আমার স্বার্থকতা। এ বিষয়ে সামান্য হলেও আলোচনা করতে পারায় আবারো আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

হাদীসে রয়েছে : "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি।"[2] তাই সর্বপ্রথম আমার পিতার জন্য দো'আ করি, আল্লাহ যেন তাকে মাগফিরাত ও রাহমাত দ্বারা বেষ্টন করে নেন। যার সর্বাত্মক চেষ্টার ফলেই হয়ত আল্লাহ তাঁর রহমতে দ্বীনি ইলমের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখার তওফিক্ব দিয়েছেন। যিনি দীর্ঘ দিন সরকারী মাদ্রাসায় হাদীসের খেদমাত করলেও আমাকে শুধু এজন্য কওমি মাদ্রাসায় পড়িয়েছেন যাতে করে আমার মাঝে ইলমি দক্ষতা ও সুন্নাতের পাবন্দি এই দুটি জিনিস

---

[2] তিরমিযী, সুনান, যে তোমার প্রতি দয়া করেছে তার শুকরিয়া অনুচ্ছেদ, নং:১৯৫৫। হাদিসটি সহীহ লিগাইরিহি।

অর্জিত হয়। জানি না তাঁর এ আশা কতটুকু কার্যকর হয়েছে। আজ তিনি জীবিত থাকলে এই ক্ষুদ্র মেহনতটি দেখলে হয়ত অত্যন্ত খুশি হতেন। আল্লাহ যেন এই খেদমাতটুকু ক্ববুল করেন। ক্ববুল হলে হাদীসের ভাষায় তিনি অবশ্যই এর ছওয়াবের অংশ পাবেন।

এরপর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার সকল উস্তাদদের যাদের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলেই আমার মাঝে যেটুকুই হোক ইলমের বীজ বপন হয়েছে। তাদের ইলমি অনুদানের সাথে সাথে বিভিন্ন জনের আরো বিভিন্ন ধরণের অনুদান রয়েছে, ছোট পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এক কথায় জীবিত সবার কৃতজ্ঞতা, দীর্ঘ বরকতময় হায়াত কামনা এবং মৃতদের জন্য রাহমাত ও মাগফিরাতের দো'আ করছি।

একজনের নাম নিলেই আরেকজনের অবমূল্যায়ন নয়, এর আলোকে যার নাম উল্লেখ না করে পারছি না, তিনি হলেন আমার উস্তায মুহতারাম মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া। যার ইলমি সহ বিভিন্ন অনুদান আমার রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়। তাঁর ঋন পরিশোধ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। দ্বীনি ইলমের কিঞ্চিত যা কিছুই অর্জন করেছি তার সিংহভাগই মূলত তাঁর সাথে দীর্ঘ দিনের সুহবতের ফসল বলে মনে করি। হক্ব বোঝার পর কারো দোহাই দিয়ে এক ইঞ্চি না সরার চেষ্টা মূলত তাঁরই দীক্ষা। আরো

কিছু লিখার ইচ্ছা থাকলেও এ কথাগুলো লিখতেই চক্ষু ছলছল করায় আর লিখতে পারছি না। আশাকরি তিনি আমার এই ক্ষুদ্র রচনা দেখে আনন্দিত হবেন এবং এটিকে আমার মাঝে তাঁর নিজের দীক্ষার প্রকাশ মনে করে আমার জন্য দো'আ করবেন। দো'আ করি আল্লাহ তাঁর হায়াতকে বরকতময় করে তুলুন। জাতিকে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার ধারাবাহিকতা দীর্ঘ করে দিন।

রচনাটি লিখার ক্ষেত্রে আরো যারা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস দিয়েছেন তাদের সবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে মাওলানা আব্দুল্লাহ মানসুর ও আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র হাফেজ মাওলানা ইয়াহ্ইয়া রচনাটির প্রুফ দেখার কষ্ট বরণ করায় তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদের সাথে সাথে তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

রচনাটি লিখতে হাদীসের ক্ষেত্রে একমাত্র সহীহ হাদীসের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে। দু-একটি হাসান পর্যায়ের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যা মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। দ'য়িফ বা দুর্বল কোনো হাদীসের উপর নির্ভর করা হয় নি।

নির্ভুল তথ্য প্রদানের লক্ষে, প্রতিটি হাদীস, অন্যান্য তথ্য, কারো উদ্ধৃতির উপর নির্ভর না করে মূল কিতাব দেখে সেখান থেকে

বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিটি হাদীসের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে মুদ্রনের কমবেশের কারণে হাদীস বা অন্যান্য তথ্য অনুসন্ধান করে বের করতে বেগ পেতে না হয়।

হাদীস সহ অন্যান্য তথ্যসূত্র টিকা আকারে বাংলায় উল্লেখের সাথে সাথে আলেমগণের সুবিধার্থে মূল মতনের পাশাপাশি আরবীতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি তথ্যসূত্র উল্লেখের পাশাপাশি সাধ্যানূযায়ী বর্ণিত কিতাবের লিখকের নাম, তাঁর জন্ম-মৃত্যু বা শুধু মৃত্যু সন মূল বইয়ে অথবা টিকায় উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে তাঁর যুগ দেখে আসলাফিয়্যাত তথা সিনিয়ারিটির মূল্যায়ণ করা হয়।

হাদীসের বর্ণনায় বিষয়বস্তু এক থাকা সত্বেও অনেক সময় শব্দের সামান্য ব্যতিক্রম থাকে। তাই অনেক হাদীস একাধিক কিতাবে থাকা সত্বেও একাধিক কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয় নি। বরং যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হাদীসের যে কিতাবে হুবহু রয়েছে শুধুমাত্র সেই কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

নিজের ইলমি ও ভাষাগত দুর্বলতা থাকা সত্বেও এ বিষয়ে রচনার কাজে হাত দেওয়ার সাহস যোগার কারণ পাঠকগণ

আশাকরি বুঝতে পেরেছেন। ভুল হতে পারে এই আশায় কোনো কিছু না লিখলে আজ পৃথিবীতে কোনো রচনাই থাকত না। ভুলের উর্ধ্বে থাকার মু'জিযা একমাত্র আল্লাহর কালামের। 'মানুষ মাত্রই ভুল' এই প্রবাদ যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি ভুলের সমালোচনা করেন না। নবীগণ ছাড়া কেউই যেখানে ভুলের উর্ধ্বে নয়, সেখানে আমার মত দুর্বলের কথা কী হতে পারে। তাই ভুল থাকবেই। আপনার কাজ হচ্ছে "দীন উপদেশের নাম" হিসেবে বাস্তব ভুলের সংশোধনের পথ খোঁজা। যথাসাধ্য বিশুদ্ধ কথা লিখার চেষ্টা করেছি, তবুও ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। তাই যে কোনো ইলমি, ভাষাগত, তথ্যগত ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে অবগত করা আপনার ইলমি আমানত মনে করবেন। আপনার সঠিক পরামর্শ শ্রদ্ধার সাথে সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

বিনীত: মোস্তফা সোহেল হিলালী

সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব অনেক জরুরী ও দীর্ঘ বিষয়। শরয়ী বিধানের দ্বিতীয় উৎস এই সুন্নাত, তাই তা অনেক দীর্ঘ হওয়ার কথা। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ের উপর অনেক কিতাব রচনা করেছেন।[3] আমাদের মূল আলোচনা সুন্নাত বা বিদ‘আত নিয়ে নয়। তাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা নয়। তথাপি প্রচলিত বিভিন্ন খতম যা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় তা বুঝতে সুন্নাত ও বিদ‘আত বোঝার বিকল্প নেই। তাই অত্যন্ত সংক্ষেপে দুটি বিষয়েই একেবারেই সামান্য আলোচনার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। যাতে করে খতমের তাৎপর্য বুঝা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। বাস্তব কথা হলো, যিনি প্রকৃতপক্ষ সুন্নাত ও বিদ‘আত চিনে নিয়েছেন তার কাছে প্রচলিত খতমের তাৎপর্য আলোচনা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার

---

[3] বাংলাভাষীদের জন্য এ বিষয়ের উপর প্রখ্যাত আলেমে দীন ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রচিত ‘এহ্ইয়াউস সুনান’ বইটি আমার ধারণা মতে অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। সাধারণের চেয়ে আলেমদের জন্য বইটি অত্যন্ত বেশি উপকারী বলে পড়ে বুঝতে পেরেছি। বইটি পড়ে মন্তব্য করার জন্য উলামায়ে কেরামের কাছে অনুরোধ রইল। উনার প্রতিটি বই একেকটি তাজদীদি খেদমাত বলে অধমের কাছে মনে হয়েছে। আল্লাহ উনার হায়াতকে বরকতময় করে দীনের আরো বেশি খেদমাত করার সুযোগ দিন।

মাধ্যমে সুন্নাত ও বিদ‘আত দুটি বিষয়কে একটু বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

সুন্নাতের পরিচয়

সুন্নাত শব্দের শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ: ছবি, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা, রীতি, আদর্শ ইত্যাদি।[4] শরয়ী পারিভাষিক অর্থ উল্লেখ করতে ইবনু মানযুর[5] লিখেন:

"وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث".

‘‘তবে যখন শরীয়তে সুন্নাত শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ের আদেশ করেছেন, যে সব

---

[4] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: سنن , ১৩/১২৪।

[5] আরবী ভাষার বিশাল শব্দ ভান্ডার সম্বলিত বিখ্যাত অভিধান ‘লিসানুল-আরব’ এর রচয়িতা আবুল ফযল জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর আল-আনসারী, জন্ম: ৬৩০ ওফাত: ৭১১ হিজরী, মোতাবেক: ১২৩২-১৩১১ ঈসায়ী। মূল আফ্রিক্বী বংশীয়, তবে তার জন্ম ও মৃত্যু মিশরে। (আল-আ‘লাম: ৭/১০৮।

থেকে নিষেধ করেছেন, কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে দিকে আহ্বান করেছেন, যা সম্মানিত কিতাব কুরআনে বলা হয় নি। এ জন্যই বলা হয়, শরীয়তের দলীল কিতাব ও সুন্নাত। অর্থাৎ হাদীস এবং কুরআন"[6]

উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে সুন্নাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

" السنة في اصطلاح الأصوليين هي "ما صدر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – غير القرآن" وهذا يشمل: قوله:– صلى الله عليه وسلم–، وفعله، وتقريره، وكتابته، وإشارته، وهمه، وتركه ".(معالم اصول الفقة عند اهل السنة والجماعة ١– ١١٨)

"উসূলীদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে, "কুরআন ছাড়া যা কিছুই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পেয়েছে" এই সংজ্ঞায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[6] লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত।

ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, স্বীকৃতি, লিখা, ইঙ্গিত, প্রতিজ্ঞা ও বর্জন সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।”[7]

আল্লামা শাওকানী[8] রাহ. সুন্নাতের সংজ্ঞাটি যেভাবে বর্ণনা করেন:

" وأما معناها شرعًا: أي: في اصطلاح أهل الشرع فهي: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على ما ليس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة كقولهم: فلان من أهل السنة ". (ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، الفصل الاول، في معنى السنة لغة وشرعا ١-٩٥)

“শরয়ী পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ, অর্থাৎ শরীয়তবিদদের পরিভাষায় সুন্নাত হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু

---

[7] ড. মুহাম্মদ হুসাইন ইবন হাসান, মা‘আলিমুল উসূলিল ফিক্বহী ‘ইনদা আহলিস্-সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ, দ্বিতীয় আলোচনা, সুন্নাতের সংজ্ঞা, পৃষ্টা:১১৮।

[8] মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আশ্-শাওকানী। ১১৭৩-১২৫০ হিজরী, ১৭৬০-১৮৩৪ ঈসায়ী। ইয়ামান এর সান‘আর ফক্বীহ, মুজতাহিদ। উসূল, হাদীস, ফিক্বহ, তাফসীর সর্ব বিষয়ে তার পান্ডিত্য ও রচনা বিদ্যমান।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও সমর্থন। ভাষাবিদ ও হাদীস বিশারদদের নিকট ব্যাপক অর্থে তা ওয়াজিব এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে ফিক্বহবিদদের পরিভাষায় তারা ওয়াজিব নয় এমন বিষয়ের উপর সুন্নাতের প্রয়োগ করে থাকেন। এর বিপরীতে বিদ‘আত শব্দটি ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়: অমুক আহলুস্-সুন্নাহ।”[৭]

উপরের সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ফিক্বহের পরিভাষায় সুন্নাতের একটি অর্থ, ফরয এবং ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য আমল।

তবে সুন্নাতের মৌলিক অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বিক জীবন আদর্শ। ফরয, ওয়াজিব ও নফল সবকিছুর উপর সুন্নাতের ব্যবহার হাদীসে প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শই দীন। জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিকের গুরুত্বের তারতম্য থেকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা থেকে ফরয,

---

[9] আল্লামা শাওকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহ্ক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল, প্রথম পরিচ্ছেদ, সুন্নাতের আভিধানিক এবং শরয়ী অর্থ, ১/৯৫।

ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইবাদতের মধ্যে সুন্নাতের ব্যতিক্রম মানেই দীনের মধ্যে তাহরিফ বা পরিবর্তন। দীনকে আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ করার ঘোষণা[10] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোচ্চ আদর্শ বলে ঘোষণা[11] দিয়ে দিয়েছেন। তাই কোনো ধরণের কম-বেশি, যোগ-বিয়োগ করার সুযোগ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যে ইবাদত যেভাবে করেছেন তা তখন সেভাবে করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করলে তা খেলাফে সুন্নাত বলে অগ্রাহ্য হবে।

সুন্নাতের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শকে পূর্ণাঙ্গরূপে মেনে নেওয়াই একজন মুমিনের কর্তব্য। তার জীবনাদর্শের বাইরে যাওয়ার চিন্তা করা মুমিন কল্পনা করতে পারেন না। সুন্নাতের বাইরে যাওয়াকে তিনি তার আখিরাতের ঝুঁকি মনে করেন। মুমিন জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে হুবহু নবীর আদর্শের উপর থাকাকেই কর্তব্য মনে করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তাকে এক সুঁতো পরিমাণ বাইরে যেতে দেয় না। কদাচিৎ

---

[10] সূরা মায়েদাহ, আয়াত: ৩।

[11] সূরা আহযাব, আয়াত: ২১।

এমন হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». (صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب كون النهي عن المنكر من الايمان...، رقم:١٨٨)

‘‘আল্লাহ তা‘আলা আমার পূর্বে যখনই কোনো জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী ও সাথী দিয়েছেন, যারা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন, তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। অনন্তর তাদের পরে এমনসব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে তারা মুমিন, যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের কথা দ্বারা জিহাদ

করবে তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরের ঘৃণা দ্বারা জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর বাইরে সরিষার দানা পরিমানও ঈমান নেই।"[12]

সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব এবং এর বাইরে যাওয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। কুরআনের একাধিক জায়গা এবং একাধিক হাদীসে এ বিষয়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় সুন্নাত নয়, তাই আর কোনো আয়াত বা হাদীস উল্লেখ করছি না।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাব'য়ি তাবিঈন, অনুসৃত চার ইমাম সহ কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগের আলেমগণ উপরোক্ত হাদীসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাঁর দীন তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ রক্ষা করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন নায়েব তৈরী করেছেন। যুক্তি বা বিবেক দ্বারা দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন, ইবাদতে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে সজাগ থেকে সর্বদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সংরক্ষন করার চেষ্টা করেছেন এবং

---

[12] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অঙ্গ....,নং: ১৮৮।

সক্ষম হয়েছেন। সুন্নাতের বাইরে যাওয়া মানেই ভ্রান্তির পথ উম্মুক্ত করা এ কথা বুঝতে তাদেরকে বেগ পেতে হয় নি। সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা এমন একদল লোকের মাধ্যমে তার নবীর সুন্নাতকে রক্ষা করবেন যারা নবীর হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার চেষ্টা করবেন। সুন্নাতের বাইরে কিছু দেখলেই যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই দল বা তাদের সহযোগী হিসেবে কবুল করুন। শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী[13] রাহ. সুন্নাতের উপর থাকার গুরুত্ব বুঝাতে উপরোক্ত হাদীস সহ আরো কিছু হাদীস উল্লেখের পূর্বে লিখেন,

" قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مداخل التحريف بأقسامها . وغلظ النهي عنها ، وأخذ العهود من أمته فيها ، فمن أعظم أسباب التهاون ترك الأخذ بالسنة ".

[13] হিন্দের প্রখ্যাত মুহাদ্দীস, আহমদ ইবন আব্দুর রহীম আশ-শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী। যার তাজদীদি বা সংস্কারমুলক কর্ম আরব 'আজম সর্বজন স্বীকৃত। তার লিখিত বিভিন্ন কিতাব এর জলন্ত প্রমান। জন্ম: ১১১৪ হিজরী, ওফাত: ১১৭৬ হিজরী। আফসোসের বিষয়, উপমহাদেশের এ মহান ব্যক্তিত্বের নাম আমাদের মুখে থাকলেও তার চিন্তাধারার বাস্তব কোনো মূল্যায়ন আমাদের মাঝে নেই। তাঁর চিন্তাধারা ও তাঁর রচনা সমগ্রের বাস্তব মূল্যায়ন আরব আলেমগণ করে থাকেন। তাঁর রচনা তাদের পাঠ্য সিলেবাস এর প্রমাণ।

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রকার তাহরিফ তথা দীনের বিকৃতি প্রবেশ করানো থেকে সতর্ক করেছেন, তাহরিফ থেকে কঠোর নিষেধ করেছেন, উম্মত থেকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, এ ব্যাপারে শিথিলতার সবচেয়ে বড় কারণ হলো সুন্নাতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া..."[14]

এরপর তিনি হুবহু সুন্নাতের অনুকরণ না করার সতর্কতা সম্বলিত বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করেন। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় তা উল্লেখ করছি না। পাঠকের কাছে তার এই আলোচনাটি দেখে নিতে অনুরোধ রইল। সারকথায় তিনি সুন্নাতের মধ্যে কম বেশ, সংযোজন, বিয়োজন, বাড়াবাড়ি সবকিছুকেই দীনের তাহরীফ বা বিকৃতি গণ্য করেছেন এবং তা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

সারকথা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতিই সুন্নাত। যা তিনি ফরয হিসেবে করেছেন তা ফরয হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা নফল হিসেবে করেছেন তা নফল

---

[14] মুহাদ্দিসে দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, কিতাব ও সুন্নাত আকড়ে ধরা অধ্যায়, ১/৩৫৭।

হিসেবে পালন করা সুন্নাত। যা সর্বদা করেছেন তা সর্বদা করা, যা মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করা সুন্নাত। যা সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করা, যা মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করা সুন্নাত। যেই কাজ যেই পদ্ধতিতে করেছেন তা সেই পদ্ধতিতে পালন করাই সুন্নাত। কোনো কিছুতে বেশ কম হলেই খেলাফে সুন্নাত বলে গণ্য হবে। করণীয় বর্জনীয় সকল ক্ষেত্রে তাঁরই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন:

"جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه و سلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه و سلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال (أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ". (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم:٤٧٧٦)

“তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট গিয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। যখন তাদেরকে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানানো হলো প্রশ্নকারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন বলে মনে হলো। তারা বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহ্গার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা) তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে নামায পড়ব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা রোজা রাখব, কখনই রোজা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব, কখনো বিবাহ করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা জানতে পেরে তাদের কাছে এসে বললেন: তোমরাই কি এমন এমন কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তাক্বওয়াবান। তা সত্বেও

আমি মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখি, আবার মাঝে মাঝে নফল রোজা রাখা পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় নফল সালাত আদায় করি আবার কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”[15]

পাঠক, একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। এখানে তিনজন সাহাবীর কেউই নাজায়েয কোনো কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন নি। প্রত্যেকেই ভালো কাজের নিয়ত করেছেন। নফল নামায কতই না উত্তম ইবাদত, নফল সালাতের মাধ্যমে সময় কাটানো মুমিনের উত্তম ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[16] নফল সিয়াম পালন করা কতই না উত্তম কাজ। বেশি বেশি ইবাদতের জন্য বিবাহ শাদিতে নিজেকে জড়িত না করা কতই না উত্তম নিয়ত বা কল্পনা। তথাপি এই কর্মগুলোকে

---

[15] সহীহুল বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, নিকাহের প্রতি উৎসাহ অনুচ্ছেদ, নং: ৪৭৭৬।

[16] সুয়ূতী, আল-জামি‘উল কবীর, হামযা হরফে হাদীস, নং: ৭৯৩৫, আলবানী, সহীহ ওয়া দ‘য়ীফুল জামি‘য়িস সাগীর, নং: ৭৩১৭, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, তারগীব ফিস সালাত অনুচ্ছেদ, নং:৩৯০, হাদীসটি হাসান। হাদীসের ইবারতটি হচ্ছে: “الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অপছন্দ বলে আখ্যায়িত করলেন তার কারণ কি? সাধারণ অপছন্দ নয়, এমন অপছন্দ যার কারণে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না। বাহ্যত তাদের এমন নিয়তের উপর নবীজীর বাহবা দেওয়ার কথা ছিল। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক বাহবামুলক শব্দ প্রয়োগ করে, আমি যা পারি না তোমরা তা করছ বলে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরার কথা। আমাদের যুক্তি বা সমাজের বাস্তব চিত্র এমনটিরই দাবী রাখে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্টো তাদের উপর রাগ করলেন কেন? বাহ্যত বিষয়টি একটু উল্টো মনে হলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের জন্য এর রহস্য বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। কেননা ইবাদত মূলত কম বা বেশি করার নাম নয়। বরং আল্লাহর হুকুম তাঁর রাসূলের পদ্ধতির পূর্ণ অনুসরণ করে পালনের নাম। এখানে যদিও মূল ইবাদতের মধ্যে পূর্ণ অনুসরণের বৈপরিত্য নেই, তথাপি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের সাথে বৈপরিত্য আবশ্যই। কেননা, রাত কাটাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে, কিছু সময় সালাত আদায় করা, কিছু সময় ঘুমানো। যিনি সারা রাত সালাতে কাটাচ্ছেন তাঁর আমল বেশি হলেও রাত কাটানোটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক নয়। ঠিক এমনিভাবে সিয়াম ও বিবাহের বিষয়টিও। এমন আমলকারীর মনে ধীরে ধীরে সুন্নাতের

প্রতি অবজ্ঞা জন্ম নেয়। সুন্নাত মোতাবেক চলা তার কাছে কম মনে হয়। যেমনটি সাহাবিদের মত ব্যক্তিত্বের মনে জড় বাঁধতে শুরু করেছিল বলে বর্ণিত হাদীস থেকেই আমরা বুঝতে পারছি। এটি একটি বাস্তব বিষয় যা আমরা আমাদের সমাজ বা আমাদের নিজ থেকেই যাচাই করতে পারি। যেমন ধরুন, এক ব্যক্তি রাতে এশার সালাত জামাতে আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন, রাতের শেষভাগের দিকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং ফজরের সালাত জামাতে আদায় করেন। আরেক ব্যক্তি এশা এবং ফজর জামাতে আদায়ের সাথে সাথে সারা রাত জেগে সালাত আদায় করেন, স্বাভাবিকত দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে একথা জড় পাকাবে যে, আমি প্রথম ব্যক্তির চেয়ে বেশি ইবাদত করছি, তার থেকে আমার কাজ উত্তম, কেননা সে কিছু সময় ঘুমিয়ে নামাযের মত শ্রেষ্ট ইবাদত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আল্লাহর শোকর আমি বঞ্চিত হচ্ছি না। তার মনে একথার জড় না পাকালে তিনি প্রথম ব্যক্তির মত কিছু সময় ঘুমানোর কথা। যদি আমরা ধরেই নেই যে, তিনি এমন মানুষ যার মাঝে এমন কল্পনা আসতে পারে না, তবে অন্য মানুষের মনে একথার বীজ অবশ্যই বপন হবে। সমাজের সাধারণ থেকে নিয়ে বড় বড় ব্যক্তিত্বের কথাবার্তা থেকে এমন বিশ্বাস পাওয়া যায়। যেমন কেউ সারা রাত জেগে ইবাদত করলে তাকে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি তুলে ধরা হয় বা বেশি পরহেযগার মনে করা হয়, যিনি রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়

করেছেন আবার ঘুমিয়েছেন। যেমন বলা হয়, অমুক এত বছর ঘুমাননি, অমুক এত বছর এক অযু দিয়ে এশা এবং ফজর আদায় করেছেন[17]। এবার আপনি প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সাথে তুলনা করুন। প্রথম জনের রাতের ইবাদত কম, তবে রাত কেটেছে সুন্নাত মোতাবেক। দ্বিতীয় জনের রাতের ইবাদত বেশি, তবে তাঁর রাত হুবহু সুন্নাত মোতাবেক কাটেনি। এই দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বিতীয় ব্যক্তির রাত কাটানোকে উত্তম মনে করা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞার নামান্তর। কেননা যার রাত কাটানো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলল তাকে অনুত্তম, আর যার রাত কাটানো তাঁর সাথে মিলেনি তাকে উত্তম মনে করা সুন্নাতকে অনুত্তম মনে

---

[17] কারো মনে আসতে পারে, আবু হানিফা রাহ. যেহেতু ৪০ বছর এক ওযু দিয়ে এশা ফজর আদায় করেছেন বলে শুনা যায়, অতএব তার চল্লিশ বছর খেলাফে সুন্নাত ভাবে রাত কেটেছে, অথচ এমন রাত কাটানো শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছেন। অধমের খেয়াল মতে এ সব হচ্ছে প্রশংসা না বুঝে প্রশংসায় সীমালঙ্গন। এসব কথার যেহেতু সহীহ কোনো ভিত্তি নেই, সুতরাং আবু হানিফার মত মহান পন্ডিত, মুজতাহিদ, যিনি হবহু সুন্নাতের অনুসরণ থেকে এক চুল পরিমান সরতে চান না, বিদ‘আত সন্দেহ হলে যিনি সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন,অনেক মাসআলা মাসাঈল যার প্রমাণ বহন করে, এমন ব্যক্তির দিকে এ সব কথা সম্পৃক্ত করার কোনো যুক্তি বা প্রয়োজন নেই।

করা ছাড়া কিছু নয়। এভাবে লোকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে সরে যাওয়া এবং অন্য পদ্ধতিকে উত্তম জ্ঞান করা তাঁর মনে স্থান নিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে তাঁর ইবাদত বেশি এ কথা দিলে বদ্ধমুল হবে। আর এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত সাহাবিদের উপর তাদের নিয়ত মহৎ থাকা সত্বেও রাগ করেছেন।

মোটকথা: সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদেরকে মুত্তাবি'য়ি সুন্নাত বা সুন্নাত অনুসারী বলে দাবী করতে পারব। নামাযে তার কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে তা আদায় করতেন, কোনো নামাযকে কতটুকু গুরুত্ব দিতেন। রোজার ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, তিনি কোনো রোজা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে আদায় করতেন। এভাবে প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তার কি শিক্ষা, কি পদ্ধতি সবকিছুই আমাদেরকে তাকে ফলো করতে হবে।

কুরআন তেলাওয়াতে তাঁর কি শিক্ষা, তিনি কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, কী উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করতেন, তাঁর আদর্শ থেকে গ্রহণ করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাহাবিদের কি শিক্ষা দিলেন, সাহাবিরা হাদীসের সাথে কি আচরণ করলেন, তাঁর

হাদীসের মাধ্যমে আমাদের কী করা উচিত, সর্বক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ বিদ্যমান। এভাবে কালেমার ক্ষেত্রে তিনি কী শিক্ষা দিলেন, যিকরের বেলায় তার শিক্ষা কী, তিনি যিকরে কী কী শব্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি কোন যিকর কোন পদ্ধতিতে করতেন তা জেনে সেই পদ্ধতিতেই আমল করতে হবে। অনুরূপ তাসমিয়া, দো'আ, এক কথায় কোনো আমলের ক্ষেত্রেই তার শিক্ষা ও আদর্শের বাইরে যাওয়া যাবে না। তার আদর্শের ব্যতিক্রম করতে কোনো যুক্তি যোগ করা যাবে না। তবেই আমরা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী বলে নিজেকে দাবী করতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তার রাসূলের সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করার তওফিক দিন। আমীন।

❋❋❋❋❋

বিদ‘আতের পরিচয় ও পরিণাম

বিদআতের সংজ্ঞা

বিদ‘আত শব্দের শাব্দিক অর্থ নব উদ্ভাবন। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু মানযুর লিখেন : “বিদ‘আত অর্থ : নতুন সৃষ্ট এবং দীনের পূর্ণতার পর যা উদ্ভাবন করা হয়েছে”।[18] দ্বিতীয় অর্থটি মূলত পরিভাষিক। ইবনু ফারিস[19] বিদ‘আতের অর্থ লিখেন : পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা, শুরু করা বা প্রচলন করা।[20]

লিসানুল আরব অভিধান থেকে আমরা শাব্দিক অর্থের সাথে সাথে বিদআতের পরিভাষিক অর্থ জানতে পেরেছি। আরেকটু স্পষ্ট

---

[18] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ ‘ بدع ’, ৮/৬।

[19] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইমাম আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস ইবন যাকারিয়া আল-কাযবীনি আর-রাযি, ৩২৯-৩৯৫ হিজরী, ৯৪১-১০০৪ ঈসায়ী।

[20] ইবনু ফারিস, মু‘জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ, মাদ্দাহ ‘ بدع ’, ১/২০৭, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত।

হওয়ার জন্য ফিক্বহী পরিভাষায় বিদ‘আতের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা উল্লেখ করা হল :

"البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية".(الاعتصام، الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها...،١-٢٦)

‘‘বিদ‘আত হচ্ছে, দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার সেই উদ্দেশ্য যা শরয়ী পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য।’’[21]

কেউ কেউ বলেন :

‘‘দীনের মধ্যে আবিষ্কৃত পদ্ধতি, যা শরয়ী পদ্ধতির সামঞ্জস্য, এই পদ্ধতির উপর চলার উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ সুব্হানাহুর ইবাদতের মধ্যে বৃদ্ধি করা।’’[22]

---

[21] আবু ইসহাক্ব ইবরাহিম ইবনু মুসা আশ-শাত্বিবী আল-মালিকী, ৭৯০ হিজরী, আল-ই‘তিসাম, প্রথম অনুচ্ছেদ, বিদআতের সংজ্ঞা ও তার অর্থ..., ১/২৬।

[22] প্রাগুক্ত।

শরয়ী পদ্ধতি বলতে ইবাদতের সুন্নাত পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে। কেননা সুন্নাত পদ্ধতি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত জাতীয় যে বিষয়ে তিনি যে পদ্ধতি উম্মতকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তাই শরয়ী পদ্ধতি। এর বাইরে কোনো শরয়ী পদ্ধতি নেই। এই অর্থেই আহলুস্সুন্নাহ শব্দের বিপরীতে আহলুল বিদ'আহ শব্দটি উলামায়ে কেরাম প্রয়োগ করে থাকেন বলে আমরা ইতোপূর্বে দেখে এসেছি।

বিভিন্ন হাদীসে বিদ'আত বা নব উদ্ভাবিত বিষয় বুঝাতে 'মুহ্দাসাত' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। বিদ'আত বা মুহদাসাতের শরয়ী সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত শুধুমাত্র ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যে কোনো নব অবিস্কৃত জিনিসের উপর শাব্দিক অর্থে বিদআতের প্রয়োগ করা গেলেও শরয়ী অর্থে তার উপর বিদ'আত শব্দ প্রয়োগ হবে না এবং তা বিদ'আত ও মুহদাসাত সংক্রান্ত হাদীসের আওতাধীন হবে না। যেমন ধরুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটে সওয়ার হয়ে সফর করেছেন, যানবাহনের আবিষ্কার আজ আপনাকে বিমান আরোহন করাচ্ছে, আপনি বিমান আরোহন করে সফর করছেন। বিমান নব আবিষ্কার। উটের পরিবর্তে আপনি বিমান আরোহন

করছেন। এটাকে শরয়ী বিদ‘আত বলা যাবে না। কেননা উট বিমান কোনোটি ইবাদত নয়। এটি একটি বাহন মাত্র। তবে বাহনে সওয়ার হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দো‘আ পড়তেন, তিনি সফরের যে দো‘আ পড়তেন তা ইবাদত। এই দো‘আর মধ্যে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন করার সুযোগ নেই। এই দো‘আ তিনি যে পদ্ধতিতে পড়তেন আমাকেও সেই পদ্ধতিতেই পড়তে হবে। যুক্তির আলোকে এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। যেমন, উট একটি সাধারণ জন্তু, সে মাটিতে চলে, নবীজী উটে উঠতে এই দো‘আ পড়তেন। আমি আজ আকাশে চড়ছি, এই নেয়ামত অনেক বড়, সুতরাং দো‘আকে একটু বৃদ্ধি করতে হবে। অথবা নবীজী স্বাভাবিকভাবে দো‘আ পড়তেন, কেননা নেয়ামতটি স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমার নেয়ামতটি অসাধারণ, তাই বিমানে উঠেই সেজদায় পড়ে এই দো‘আ করতে হবে, অথবা সেজদায় পড়ে দো‘আটি পড়লে ছওয়াব বেশি হবে, এজাতীয় চিন্তাধারা সবই ভ্রান্ত। কেননা দো‘আ একটি ইবাদত। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গেলেই তা বিদ‘আত বলে গণ্য হবে। মোটকথা : বিদ‘আতের সম্পর্ক ইবাদতের বিষয় ও তার পদ্ধতির সাথে। বস্তুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

জনৈক ব্যক্তি একবার এক বিদ‘আত বিরোধী আলেমকে গিয়ে বললেন : আপনারা সবকিছুই শুধু বিদ‘আত বিদ‘আত করেন, তবে আপনি চশমা পরেছেন কেন? আল্লাহর রাসূল কি জীবনে কখনো চশমা পরেছেন? চশমা তো নবীজীর সময়ে ছিল না, তাহলে এটা কি বিদ‘আত নয়? আলেম বললেন : ভাই, তাহলে তো আপনি নিজেই বিদ‘আত। আপনিও তো নবীজীর সময়ে ছিলেন না। বিদ‘আত না বোঝার কারণেই মাঝে মাঝে এমন কৌতুকের সৃষ্টি হয়। চশমা কোনো ইবাদত নয়। তাই এর সাথে বিদআতের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন লোকটি নিজে কোনো ইবাদত নয়, তাই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় না থাকা, আবার এখন থাকা বিদ‘আতের বিষয় নয়। যে ইবাদত বা তার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত নয় একমাত্র তার আবিষ্কার শরয়ী পরিভাষায় বিদ‘আত বলে গণ্য হবে।

বিদআতের পরিণাম

বিদ‘আত মানেই ক্রমান্বয়ে দীনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কেননা দীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত জীবন পদ্ধতির নাম। তাঁর পদ্ধতি থেকে বিভিন্ন যুক্তির আলোকে যে ব্যক্তি বেরিয়ে পড়ে, সে মূলত দীন থেকেই বেরিয়ে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি থেকে যে যতটুকু বের হয়,

সে মূলত ততটুকু দীন থেকে বের হয়। তাই এব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পূর্ব থেকে সতর্ক করে গেছেন, যাতে করে যুক্তির আলোকে কেউ তাঁর দেখানো আদর্শ ও পদ্ধতি থেকে সরে না যায়। ইরবায ইবন সারিয়া আস্সুলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

" وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ". (سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم:٢٦٧٦)

‘‘একদিন ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী নসীহত করলেন, এতে সবার চোখে অশ্রু বয়ে গেল, হৃদয়গুলো ভীত শঙ্কিত হলো। এক লোক বলে উঠল : নিশ্চয় এটি বিদায়ী নসীহত, অতএব আপনি আমাদের

থেকে কী অঙ্গিকার নিবেন হে আল্লাহর রাসূল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি অর্জনের ওসিয়্যত (অঙ্গিকার, গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ) করছি, নেতার কথা মান্য ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে হাবশী দাস হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। আর তোমরা সব নব অবিস্কৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা এগুলো পথভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে এই অবস্থা পাবে সে যেন আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাত আকড়ে ধরে। তোমরা সুন্নাতকে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধর।”[23]

বিদ‘আত কাকে বলে বুঝতে এবং তা থেকে সতর্ক থাকতে সুন্নাত প্রেমিকদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট। আল্লাহর রহমতে সর্বদা একদল এর উপর ছিলেন বলেই সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। জান্নাতে পৌঁছতে, তাযকিয়ার চূড়ান্তে

---

[23] তিরমিযী, সুনান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম অধ্যায়, সুন্নাতকে আকড়ে ধরা এবং বিদ‘আত পরিহার করা অনুচ্ছেদ, নং:২৬৭৬, হাদীস সহীহ।

উপনীত হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে যে কোনো ক্ষেত্রে মনে স্থান দেওয়া মানেই গোমরাহীর পথ খুলে দেওয়া, যা উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্ট। এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন।

সাহল ইবনে সা‘দ, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস দেখুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

" إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي ". (صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم:٦٢١٢، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى { واتقوا فتنة... رقم:٦٦٤٣)

“আমি তোমাদের আগে হাওযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয থেকে) পান করবে, আর যে পান করবে সে কখনো

পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাওযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনব, তারাও আমাকে চিনবে, তবে তাদের এবং আমার মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করা হবে, (আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না) আমি বলব এরা আমার উম্মত। তখন (প্রতি উত্তরে) বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী সব নব উদ্ভাবন করেছিল। একথা শুনে আমি বলব : যারা আমার পর পরিবর্তন করেছেন তারা দূর হয়ে যাক, তারা দূর হয়ে যাক!”[24]

ইবাদতের যে কোনো নবআবিষ্কৃত পদ্ধতি বিদ‘আত| এতে জড়িত হওয়ার কী করুণ পরিণতি তা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি। তেলাওয়াত, যিকর, দো‘আ, দুরূদ ইত্যাদির নতুন পদ্ধতি আবিস্কারের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাড়িয়ে দিলে আমাদের মত হতভাগা আর কে আছে? আরো লক্ষ্যণীয় যে, নবীজী সবচেয়ে বেশি যে জিনিস থেকে বারণ করতেন তা হচ্ছে বিদ‘আত| সর্বদা বারণের কারণ আশাকরি স্পষ্ট হয়েছে।

---

[24] সহীহুল বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব, হাউয অনুচ্ছেদ, নং: ৬২১২, কিতাবুল-ফিতান, নং: ৬৬৪৩।

এবার নবীজীর খুতবার সিফাত বর্ণনার হাদীসটি দেখি:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله و أحسن الهدى هدى محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار". (صحيح ابن خزيمة، باب صفة خطبة النبي ﷺ، رقم: ١٧٨٥)

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তার যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করতেন, এরপর বলতেন: যাকে আল্লাহ হেদায়াত প্রদান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তাকে কেউ হেদায়াত প্রদান করতে পারে না। নিশ্চয় সর্বাধিক সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক সুন্দর আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ, নব উদ্ভাবিত বিষয় সর্বাধিক নিকৃষ্ট, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদ‘আত,

প্রত্যেক বিদ‘আত ভ্রষ্টতা এবং এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।”[25]

উপরোক্ত হাদীসটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে আমাদের যত কথা বলে গেছেন সবই হাদীস। তিনি যা বলেছেন, যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা কতবার বলেছেন? নিশ্চয় একবার, দুইবার, তিনবার, একাধিক বার, ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বার। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো তিনি কতবার বলেছেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কতটি খুতবা দিয়েছেন? একটি? দুইটি? একাধিক? অনেক? অগণিত? যতবারই তিনি খুতবা দিয়েছেন, উপরের বিষয়গুলো আলোচনা করতেন বলে আমরা জানতে পারলাম। এখান থেকে একটি ধারণা নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কতবার বলেছেন: “একমাত্র আদর্শ তাঁরই আদর্শ, তাঁর আদর্শের বাইরের সবকিছুই নব উদ্ভাবিত, সব নব উদ্ভাবিত কর্ম বিদ‘আত, সব বিদ‘আতই গোমরাহী এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত।” এছাড়া অন্যান্য হাদীসতো আছেই। নবী

---

[25] মুহাম্মদ ইবন ইসহাক্ব ইব্নু খুযায়মাহ আস-সুলামী, ২২৩-৩১১ হিজরী, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবার গুণাবলী অনুচ্ছেদ, নং ১৮৭৫।

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বহির্ভূত কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়, চাই তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসটি দেখুন:

> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد". (صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: ٢٥٥٠، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: ٤٥٨٩)

> “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমাদের এই দীনে যে ব্যক্তি নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত।”[26]

এই হলো বিদ‘আতের অবস্থা। আমলের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত চিন্তা মানেই বিদআতে লিপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া, আর বিদ‘আত মানেই দীন ধ্বংসের প্রক্রিয়া। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও কল্যাণপ্রাপ্ত

---

[26] সহীহুল বুখারী, সন্ধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: অন্যায়ের উপর লোকেরা সন্ধিবদ্ধ হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য, নং: ২৫৫০, সহীহ মুসলিম, বিচার সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: বাতিল সিদ্ধান্ত খণ্ডন এবং বিদ‘আতি কার্যকালাপ প্রত্যাখ্যান, নং: ৪৫৮৯।

যুগ তথা খাইরুল ক্বুরুনের আলেমদেরকে এব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে দেখা গেছে। বিদ‘আত দূরের কথা, বিদ‘আতের সন্দেহযুক্ত বিষয়কেও তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা রাহ.কে এতই সতর্ক থাকতে দেখা যায় যে, প্রমাণিত সুন্নাতের মাঝেও সমান্যতম হেরফের হলেই তিনি তা বিদ‘আত বলে আখ্যায়িত করতেন এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। ফিক্বহে হানাফিতে বিদ্যমান অসংখ্য মাস‘আলা এর জলন্ত প্রমাণ। এথেকেই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো: কোনো বিষয় সুন্নাত ও বিদ‘আতের মাঝে সংশয়যুক্ত হলে তা বিদ‘আত বলে গণ্য করে পরিহার করতে হবে। কারণ কাজটি যদি বাস্তবেই সুন্নাত হয়ে থাকে তবে ছেড়ে দিলে গোনাহ্গার হবে না, শুধুমাত্র ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, কিন্তু বিদ‘আত হয়ে থাকলে গোনাহ্ হবে। তাই ইমাম আবু হানিফা রাহ. এমন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করতেন। আর ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে চলাই জ্ঞানির কাজ। আল্লামা সারাখসী[27] লিখেন:

"وما تردد بين البدعة والسنة يتركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم ".(المبسوط،٢-١٤٦)

---

[27] শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন সাহাল আস্-সার্খাসি, হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুজতাহিদ আলেম। ওফাত: ৪৮৩ হিজরী, মোতাবেক ১০৮০ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম: ৫/৩১৫)

“আর যে বিষয়টি বিদ‘আতও হতে পারে আবার সুন্নাতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয় পরিত্যাগ করবে, কেননা বিদ‘আত পরিত্যাগ করা অপরিহার্য জরুরী, আর সুন্নাত পালন করা অপরিহার্য নয়।”[28]

তিনি অন্যত্র লিখেন:

"وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فإن التحرز عن البدعة واجب... وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به".(٣-٣٥٧)

“যে বিষয়টি বৈধও হতে পারে আবার বিদ‘আত হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিষয়ের উপর আমল করা যাবে না, কেননা বিদ‘আত পরিহার করে চলা ওয়াজিব,... এবং যে কাজ সুন্নাতও হতে পারে আবার বিদ‘আতও হতে পারে বলে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে এমন কাজ করা যাবে না।”[29]

---

[28] সার্খাসী, আল-মাবসূত,২/১৪৬।

[29] প্রাগুক্ত,৩/৩৫৭।

এই ছিল খাইরুল ক্বুরুন থেকে নিয়ে হানাফী মাযহাবের মূলধারার আলেমদের আদর্শ। তাই বিভিন্ন দো‘আ দুরূদ ইত্যাদির মাঝে নতুন যে কোনো সংযোজনের সবই তাদের যুগের অনেক পরের সৃষ্ট বলে দেখতে পাবেন।

এখন বিভিন্ন আমল, আমলের বিভিন্ন পদ্ধতি, দুরূদের বিভিন্ন পদ্ধতি, যিকরের বিভিন্ন পন্থা, সংযোজন বিয়োজন। দো‘আ, যিকর, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদির নতুন সংখ্যা ও তার লাভ নির্ধারণ। ইবাদতের নতুন নতুন উদ্দেশ্যের প্রণয়ন করে যদি বলি তা বিদ‘আত নয় তবে, আমি আমার নিজেকে সম্বোধন করে বলব: তুমি পৃথিবীর কাউকে বিদ‘আতি বলে আখ্যায়িত করো না। রাসূলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্জিত হয়ে তোমার কাজ যদি বিদ‘আত না হয়, তবে যাকে তুমি বিদ‘আতি বলছ তাঁর কাজ বিদ‘আত হবে কেন? তোমার বানানো পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পন্থায় না হলেও তুমি তোমার ইলম, কুরআন, হাদীস, যুক্তি ইত্যাদির অকাট্য (?) দলীল দ্বারা জায়েয প্রমাণ করতে পার। তবে তুমি যাকে বিদ‘আতি বলছ তাঁর কাছেও তোমার মত হাজারো দলীল রয়েছে। আলোচনা আর দীর্ঘ না করে আমাদের মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে বিদ‘আত বুঝা ও তা এড়িয়ে চলার তওফিক দিন। আমীন।

খতম শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ

'খতম' শব্দটি মূলত আরবী ' ختم ' শব্দের বাংলা ব্যবহার। যার মূল অর্থ হচ্ছে : কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো বা তাকে সিলযুক্ত করা। কর্ম যুগে শব্দটির অর্থ হয়, কাজটি শেষ করা। এভাবে বিভিন্ন শব্দযোগে তার বিভিন্ন অর্থ হয় যেমন, মাটি দ্বারা মুখ বন্ধ করা, এড়িয়ে যাওয়া, হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়া তথা অবুঝ করে দেওয়া, কোনো বস্তুর শেষে পৌঁছা ইত্যাদি। কিতাব বা কুরআন শব্দযোগে তার অর্থ হয়: সম্পূর্ণটুকু পড়ে শেষ করা।[30]

কুরআনে শব্দটি ক্রিয়ামুলে শুধুমাত্র হৃদয়ে মোহর এঁটে দেওয়ার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٧ ﴾ [البقرة: ٧]

"আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ও কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ রয়েছে"।[31]

---

[30] ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, মাদ্দাহ: ' ختم ' ১২/১৬৩।

[31] সূরা বাক্বারা, ৭।

তবে বিভিন্ন হাদীসে ‘ختم’ শেষ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়া, সুরাটি শেষ পর্যন্ত পড়া ইত্যাদি শব্দ হাদীসে ব্যবহার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পড়া বলতে যেমন পুরোটা পড়া বুঝায়, তেমনি যে কোনো জায়গা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পৌছলেও এ শব্দ ব্যবহার হয়। এ ক্ষেত্রে পুরো সূরা পড়া উদ্দেশ্য নয়। যেমন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক ও ওযু করার পর সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নং আয়াত থেকে পড়তে শুনেন, অতঃপর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন :

" فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة...". (صحيح مسلم، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم:١٨٣٥)

“অতঃপর তিনি (রাসূল ﷺ) এই আয়াতগুলো পড়েন, এমনকি সূরা শেষ করেন”।[32]

এখানে সূরা খতম বলতে পুরো সূরা পড়া নয়, বরং ১৯০ নং আয়াত থেকে শুরু করে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়া।

---

[32] সহীহ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, রাতের সালাতে দু‘আ ও রাতে জাগা অনুচ্ছেদ, নং:১৮৩৫।

কুরআন সম্পূর্ণটা পড়ার ক্ষেত্রে খতম শব্দের ব্যবহার সাহাবিদের মধ্যে ছিল। তবে 'হাদীস খতম' বা 'হাদীসটি খতম' এমন কোনো ব্যবহার বা প্রয়োগ তাদের মাঝে ছিল বলে জানতে পারি নি। 'খতমে বুখারী'র আলোচনায় এমন ব্যবহার না থাকার কারণ আমরা বুঝতে পারব ইন-শাআল্লাহ। তবে হাদীসটি খতম বলতে তা পুরোটা পড়া বুঝাবে। তাই কেউ একটি হাদীস পড়ে হাদীসটি খতম করেছি বলতে কোনো বাধা নেই। এভাবে খতমে দো'আ ইউনুস বললে পুরো দো'আটা পড়া বুঝাবে, যদিও এমন বলার প্রচলন ছিল না। কিন্তু খতমে ইউনুস বললে: এতবার পড়া, অমুক খতম বললে: এতবার পড়া, তমুক খতম বললে এতবার পড়া, এসব ব্যবহার সম্পূর্ণ নতুন মনগড়া বানানো।

খতম শব্দটি শেষ পর্যন্ত পৌঁছা বা পুরোটা পড়ার অর্থে ব্যবহার হলেও 'খতম করানো' বা 'খতম পড়ানো', এমন কোনো ব্যবহার বা প্রয়োগ না সাহাবিদের যুগে ছিল, না খাইরুল ক্বুরুনে ছিল। কেননা কুরআন, হাদীস, দো'আ, দুরূদ, যিকর ইত্যাদির আমলের এই সিস্টেম বা পদ্ধতিটি একেবারেই নতুন। তাই 'খতম' শব্দের শাব্দিক অর্থ অভিধানে পেলেও আমাদের সিস্টেমের তার পারিভাষিক কোনো অর্থ আহলে ইলমদের কোনো কিতাবে পাবেন না। আমরা 'খতম' বলতে যা বুঝি এ সবকিছু সোনালীযুগ দূরের

কথা, মুহাক্কীক্ব কোনো আলেম থেকে এ গুলোর আবিষ্কার হয়নি বলে পরিস্কার বুঝা যায়। আমাদের জানামতে প্রচলিত যে খতমগুলো রয়েছে সেগুলোর আলোচনায় আমরা এগুলোর তাৎপর্য, যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

মহাগ্রন্থ আলকুরআন আল্লাহর কালাম এবং প্রতিটি মানুষের জীবন বিধান। এর গুরুত্ব কারো কাছে অজানা নয়। তাই সর্বপ্রথম আমাদের সমাজে অধিকহারে প্রচলিত এই মহাগ্রন্থ আল কুরআনের খতম দিয়েই শুরু করছি। নিজে কুরআন না পড়ে, কুরআনের শিক্ষা নিজে গ্রহণ না করে, যে কোনো কারণে অন্যকে ভাড়া করে কুরআন পড়িয়ে নেওয়ার যথার্থতা কতটুকু তা আলোচনা করলে বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

খতমে কুরআন

কুরআন প্রতিটি মুসলিমের জীবন বিধান। এই কুরআন তাকে নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে এবং এর মর্ম বুঝে তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের ফযিলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

“তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়”।[33]১

এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

" مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل

---

[33] সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়, নং:৪৭৩৯।

الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها". (صحيح البخاري، باب فضل القرآن على سائر الكلام)

‘‘কুরআন পাঠকারী (মুমিনের) উদাহরণ সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত লেবুর ন্যায়। আর যে (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ এমন খেজুরের মত যা সুগন্ধহীন তবে খেতে সুস্বাদু। আর যে ফাসিক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ রায়হান জাতীয় গুল্মের মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিস্বাদযুক্ত। আর যে ফাসেক কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ ঐ মাকাল ফলের মত যা খেতেও বিস্বাদ (তিক্ত) আবার কোনো সুঘ্রানও নেই।[34]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

[34] সহীহুল বুখারী, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: সব কালামের উপর কুরআনের শ্রেষ্টত্ব, নং:৪৭৩৯, সহীহ মুসলিম, কুরআনের ফযিলতসমূহ অধ্যায়, হাফিজে কুরআনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:১৮৯৬।

" من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ". (سنن الترمذي، باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر)

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তার আমলনামায় একটি নেকী প্রদান করেন, আর এই নেকীটি দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না, " الم " একটি অক্ষর, বরং " أ " একটি অক্ষর, "ل " একটি অক্ষর, " م " একটি অক্ষর"।[35]

কুরআন তেলাওয়াতের এত মর্যাদা, গুরুত্ব, ছওয়াব কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত থাকা সত্বেও প্রচলিত খতমের রূপরেখায় নবী আদর্শ ও সাহাবা আদর্শের বৈপরিত্য থাকার কারণে এই কুরআন খতমের হুকুম যদি না বাচক হয় তবে যার কোনো অস্তিত্ব নবী

[35] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস সহীহ, কুরআনের ফযিলত সমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যে কুরআনের একটি অক্ষর পড়ল তার কতটুকু ছওয়াব রয়েছে, নং: ২৯১০।

জীবনে, নবীর শিক্ষা প্রাপ্ত সাহাবিদের জীবনে নেই তার হুকুম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

রূপরেখায় বৈপরিত্য বলতে যেমন, সাহাবায়ে কেরাম কুরআন নিজে শিখতেন, নিজে পড়তেন। যিনি জানেন না তিনি শিখতেন। এই শিক্ষাই তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। অনেক সময় কেউ কুরআন অপরের কাছে শুনতে চাইতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কোনো কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে শুনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন, শুনতেন। তবে অন্যকে এনে বাড়ীতে খতম করানোর কোনো রেওয়াজ তাদের মাঝে ছিল না। কেউ মারা গেলে তাদের যা করণীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন তারা শুধু তাই করতেন। কেউ অসুস্থ হলে, বিপদে পড়লে কী করণীয় তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। কেউ মারা গেলে বা অন্য কোনো সমস্যায় পড়লে কুরআন খতম করা বা খতম করানোর কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে একটিবার কাউকে বলেন নি নিজেও করেন নি। তাই সাহাবিরা এমন কর্ম কখনো করেন নি।

এখন আমরা জানতে চেষ্টা করব প্রচলিত খতমের হুকুম সম্পর্কে আদর্শবান আলেমদের কী মত। এ ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত কিতাব “আহসানুল ফাতওয়া” এর লিখক প্রসিদ্ধ ফক্বিহ রশিদ আহমদ রহ. তার কিতাবে প্রচলিত কুরআন খতম সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে যে দলীলভিত্তিক আলোচনা করেছেন, অসংখ্য আলেমের বক্তব্যের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তার এই লেখাটির অনুবাদ তুলে দেওয়াই যথেষ্ট মনে করছি। তার এ বক্তব্যের পর এ ব্যাপারে আর কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। এতে আমরা প্রচলিত খতমের তাৎপর্য যেমন বুঝতে পারব তেমনি অগণিত আলেমের মতামত পেয়ে যাব। তার আলোচনা পড়ার পর সত্য সন্ধানী মানুষের মনে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না বলে আশা করি। নিম্নে তার কিতাবের প্রশ্ন ও উত্তর হুবহু তুলে ধরছি।

প্রশ্ন: বর্তমানে কুরআন খতমের প্রচলন ব্যাপক হয়ে গেছে। যেমন, নতুন ঘর ক্রয় করা হলে কুরআন খতম করা হয়। দোকান উদ্বোধন করা হলে খতম করা হয়। কারো চল্লিশা হলে কুরআন খতম করা হয়, কারো

মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুরআন খতম করা হয়; যাতে মৃত ব্যক্তির কাছে ছওয়াব পৌঁছে। কোনো সময় এর ঘোষণা পত্রিকায় দেওয়া হয় এবং মানুষ দুর-দুরান্ত থেকে শুধুমাত্র কুরআন খতমের জন্য আসে| এমন কুরআন খতমের আমলের হুকুম কী? কুরআন হাদীসের আলোকে এর কোনো প্রমাণ আছে কি? এতে আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের লোক শরীক হতে পারবে কি? আমরা নিজে কি এমন কর্মে শরীক হয়ে গোনাহগার হচ্ছি না?

بينوا توجروا --

সুমতি দানকারীর নামে উত্তর

١ - قال الإمام محمد إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: " حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ".

(صحيح البخاري ص:٢٣٨ج:١)

(মুহাম্মদ ইসমাইল বুখারী রাহ. বলেন: ....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা- আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরার পাশে বসে আছেন। ইতোমধ্যে কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করতে লাগল। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ‘আত।[36]

٢ - وقال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى فى المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة.

(صحيح مسلم ص:٤٠٩ ج:١

[36] সহীহুল বুখারী, উমরা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার উমরা করেছেন।

(এবং ইমাম আবুল-হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ ইবন মুসলিম আল-কুশাইরী বলেন: .... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবনু যুবাইর (র) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা - আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরার পাশে বসে আছেন। আর কিছু লোক মসজিদে সালাতুদ্দোহা আদায় করছে। আমরা তাকে এদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বিদ‘আত।[37]

٣ -وقال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي رحمه الله تعالى: انهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة) هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة.

(شرح النووي على صحيح مسلم صفحه مندرجه بالا)

---

[37] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: উমরা, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উমরার সংখ্যার বর্ণনা।

(এবং শাইখ মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবন শরফ নববী রাহ. বলেন, তারা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যারা মসজিদে সালাতুদদ্বোহা আদায় করছিল তাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, তিনি বললেন বিদ'আত। এটা ক্বাযী[38] এবং অন্যান্যরা এর অর্থ নিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হলো সালাতকে মসজিদে প্রকাশ করা এবং এর জন্য সমবেত হওয়াটাই হচ্ছে বিদ'আত। মূল সালাতুদদ্বোহা বিদ'আত নয়। সালাত অধ্যায়ে মাসআলাটির আলোচনা হয়েছে।)[39]

٤- وقال الامام محمد بن شهاب المعروف بابن البزار الكردري الحنفي رحمه الله تعالى: وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع قوما اجتمعوا في مسجد يهللون ويصلون عليه الصلاة والسلام جهرا، فراح إليهم فقال ما عهدنا دلك على عهده

---

[38] কাযী আয়ায, মালেকি মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম মুহাদ্দীস, ফকীহ, আদীব, ঐতিহাসিক, একাধিক কিতাবের রচয়িতা। ৪৭৩-৫৪৪ হিজরী।

[39] ইমাম নববীর মুসলিমের ব্যখ্যগ্রন্থ, প্রাগুক্ত অধ্যায়। কিতাবুস-সালাত, (باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان) এর অধীনে আলোচনা সালাতুদ দ্বোহার আলোচনা করেছেন।

عليه السلام وما أراكم إلا مبتدعين، فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم من المسجد.

(بزازية بهامش الهنديه، ج:٦ ص:٣٧٨)

(এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবন শিহাব আল-কুরদুরী আল-হানাফী রাহ.[40] যিনি ইবনে বায্যার নামে পরিচিত, তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, তিনি শুনতে পান একদল লোক মসজিদে সমবেত হয়ে উচ্চস্বরে তাহলীল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়ছে। অতএব তিনি তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, আমরাতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনটি পাইনি। আমিতো তোমাদেরকে বিদ‘আতি ছাড়া কিছু দেখছি না। তিনি একথা বলতে বলতে তাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দেন।)[41]

---

[40] ফাতওয়া বায্যাযিয়ার মুসান্নিফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন শিহাব, ইবনে বায্যার আলকুরদুরী আল-হানাফী। মৃত্যু: ৮২৭ হিজরী।

[41] বায্যাযিয়া, হিন্দিয়ার টিকা, ৬/৩৭৮ (লেখকের দেওয়া তথ্য সুত্র মোতাবেক)।

٥ وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (بزازية بهامش الهنديه، ج:٤ ص:٨١)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সাপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আন‘আম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরূহ।

মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরূহ।)[42]

٦ وقال الفقيه المخدوم محمد جعفر بن العلامة عبد الكريم البوبكاني السندي رحمه الله تعالى في الصيرفية: قراءة القرآن لأجل المهمات والبأس مكروه. (وبعد صفحة) يكره للقوم أن يقرأ

[42] বায্যাযিয়া, হিন্দিয়ার টিকা, ৪/৮১ (লেখকের দেওয়া সুত্রে)

القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات المأمور بهما. وقيل لا بأس به. في التتارخانية من المحيط: من المشايخ من قال: إن ختم القرآن بالجماعة جهرا ويسمى "سيباره خوانده" مكروه، (الى قوله) في عين العلم: ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام(وبعد صفحة) في مفيد المستفيد من النصاب: قراءة القرآن في المجالس يكره، لأنه يقرأ طمعا في الدنيا، وكذلك في الأسواق، وكذلك على رأس القبر. قيل، ولو قرأ ولا يسأل والناس أعطوه من غير سؤال قال يكره أيضا، لأنه إذا لم يقصد السؤال لِمَ لا يجلس في بيته يقرأ. (المتانة في المرمة عن الخزانة، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤)

(এবং ফক্বীহ মুহাম্মদ জাফর[43]....সিন্দি বলেন, সাইরাফিয়্যাহ কিতাবে[44] ‘‘কঠিন বিষয় এবং অসুবিধার কারণে কুরআন পড়া মাকরূহ’’। (এবং এক পৃষ্ঠা পর) মুফিদুল মুস্তাফিদ কিতাবে এসেছে, ‘‘দলবদ্ধ হয়ে বৈঠকে কুরআন পড়া মাকরূহ, কেননা এতে শ্রবণ করা এবং চুপ থেকে শোনা পরিত্যাগ করা হয় অথচ এ দুটি বিষয়

---

[43] মুহাম্মদ জা‘ফর ইবন আব্দুল করীম আল-বুবাকানী আস-সিন্দি আল-হানাফী। তার লিখিত কিতাব, ‘আল-মাতানাহ ফিল-মারাম্মাতে আনিল খিযানাহ’।

[44] আল-ফাতাওয়া আস-সাইরাফিয়্যাহ। লিখক, হানাফী ফক্বীহ আসআদ ইবন ইউসুফ ইবন আলী মাজদুদ্দীন আস-সাইরাফী আল-বুখারী। মৃত:১০৮৮ হিজরী। (আল-আ‘লাম, ১/৩০২)

নির্দেশিত।” কেউ কেউ বলেন, “এতে অসুবিধা নেই”। ‘মুহিত’[45] কিতাবের উদ্ধৃতিতে ‘তাতারখানিয়া’[46] কিতাবে রয়েছে, “মাশায়েখের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, নিশ্চয় দলবদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা যাকে বলা হয় ‘সীপারা পড়া’ তা মাকরূহ। (আরো বলেন) আইনুল ইলমে রয়েছে, তিন দিনের কমে খতম করবে না ”। (আরো এক পৃষ্ঠা পর), “মুফিদুল মুসতাফিদে নেসাব[47] থেকে বলা হয়েছে, সমাবেশস্থলে কুরআন পড়া মাকরূহ, কেননা পাঠক তা দুনিয়ার লোভে পড়ছে। এভাবে বাজারে পড়া মাকরূহ। কবরের কাছে পড়াকেও এভাবে মাকরূহ বলা হয়েছে। যদি পড়ে কিন্তু (কারো কাছে কিছু) না চায়, আর মানুষ তাকে চাওয়া ব্যতীতই

---

[45] দেখুন, বুরহানুদ্দীন ইবনু মাযাহ (৬১৬ হি.) রচিত কিতাব ‘আল-মুহিত্বুল বুরহানী, পৃষ্টা:১৪৪, খ-:৫।

[46] ফিকহে হানাফী নিয়ে রচিত কিতাব ‘আল-ফাতাওয়া আত্তাতার খানিয়া’, লিখক, ইবনুল আলা আল-আনসারী আদ-দেহলবী আল-হিন্দি।

[47] ‘আইনুল ইলম’ ‘মুফিদুল মুস্তাফিদ’ ‘কিতাবুন-নেসাব’ ফিক্বহে হানাফীতে রচিত বিভিন্ন কিতাবের নাম।

দান করে তবে তাও মাকরূহ বলেছেন, কেননা চাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে সে কেন ঘরে বসে পড়ছে না"।[48]

٧ - وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: (تتمة) أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد وتمامه في شرحه وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي قال وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلي فرادى غير التراويح". قال في البحر: قال في البحر ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب أو في أولى جمعة منه وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل ا ه قلت: وصرح بذلك في البزازية كما سيذكره الشارح آخر الباب وقد بسط الكلام عليها شارحا المنية وصرحا بأن ما روي فيها باطل موضوع. وللعلامة نور الدين المقدسي فيها تصنيف حسن سماه (ردع الراغب عن صلاة الرغائب) أحاط فيه بغالب كلام المتقدمين والمتأخرين من علماء المذاهب الأربعة. (رد المحتار،ج:٢ص:٢٦)

---

48 আল-মাতানাহ ফিল-মারাম্মাতে আনিল খিযানাহ, ৬৩৩,৬৩৪,৬৩৫ (লেখকের দেওয়া সুত্রে)।

(এবং আল্লামা ইবনে আবেদিন[49] রাহ. বলেন, (পরিশিষ্ট) মুসান্নিফ[50] তার কথা "একা একা" বলে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন যা একটু পরে তিনি তার মতনে (বইয়ের মূল অংশে) এই বলে উল্লেখ করেন, "আর এই রাতগুলো জাগ্রত থেকে কাটানোর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া মাকরূহ" পুরো আলোচনা তার ব্যখ্যাগ্রন্থে রয়েছে। আল-হাবীল ক্বুদসীতে[51] তা মাকরূহ বলে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, "এই রাতগুলোতে যে সালাতের কথার বর্ণনা রয়েছে তা একা একা পড়তে হবে, একমাত্র তারাবীহ ব্যতীত"।

---

[49] বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ মুহাম্মদ আমীন ইবন উমর ইবন আব্দুল আযীয ইবন আবেদীন। ১১৯৮-১১২৫ হিজরী। দামেশ্কে জন্ম এবং মৃত্যু। যাকে ইমামুল হানাফিয়্যাহ ফিশ্-শাম বলে ভূষিত করা হয়। আল্লামা ইবনে আবেদীন বা আল্লামা শামী নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তার কিতাব 'রাদ্দুল মুহতার' যা ফাতওয়া শামী হিসেবে পরিচিত তা ফিকহে হানাফীর মাসাঈলে আলাউদ্দীন হাসকাফী রচিত 'আদ্দুররুল-মুখতারের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (আল-আ'লাম: ৬/৪২)

[50] মুসান্নিফ আর্থাৎ 'আদ্দুররুল-মুখতারের' রচয়িতা মুহাম্মদ ইবন আলী আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী। দামেশ্কের একজন হানাফী মুফতী। ১০২৫-১০৮৮ হিজরী। (আল-আ'লাম: ৬/৪২)

[51] 'আল-হাবীল ক্বুদসী ফিল ফুরু' লিখক, কাযী জামাল উদ্দীন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযনবী আল-হানাফী। (কাশ্ফুয যুনুন:১/৬২৭)

আল-বাহরে[52] বলেন, "এথেকে জানা যায় যে, সালাতুর রাগাইব যা রজবের প্রথম জুমুআয় পড়া হয়, এর জন্য সমবেত হওয়া মাকরূহ এবং এটি বিদ'আত। এটাকে নফল ও মাকরূহ থেকে বের করার জন্য রোমবাসীরা এই সালাতের মান্নতের যে হীলা অবলম্বন করে তা বাতিল"।

আমি বলি (ইবনে আবেদীন) বায্যাযিয়ায় তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন ব্যাখ্যাকার অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করবেন। আল-মুনইয়াহ এর দুই ব্যাখ্যাকার[53] এর উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং তারা উভয়ে স্পষ্ঠভাবে বলেছেন যে, "এ ব্যাপারে যা বর্ণনা করা হয় সব বাতিল মনগড়া। আল্লামা নুরুদ্দীন

---

[52] যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিসরী আল-হানাফী ৯২৬-৯৭০ হিজরী রচিত কিতাব 'আল-বাহরুর রায়িক্ব'। সালাত অধ্যায়। বিতর ও নফল অনুচ্ছেদ, ২/৫৬।

[53] 'আল-মুনইয়াহ' অর্থাৎ 'মুনইয়াতুল মুসাল্লী', এই কিতাবের দুই ব্যাখ্যাকার দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত, 'গুনইয়াতুল মুতামাল্লী' এবং 'আল-ক্বুনইয়া' কিতাবদ্বয়ের রচয়িতা। দুটি কিতাবই 'মুনইয়াতুল মুসাল্লী'র শরাহ। কিতাব দুটি দুর্লভ ও সম্মুখে না থাকায় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারিনি। (সংকলক)

মাক্কদিসীর[54] এ বিষয়ে একটি সুন্দর রচনা রয়েছে তিনি এর নাম দিয়েছেন ‘রাদ্উর রাগিব আন সালাতির রাগাইব’ তিনি এখানে চার মাযহাবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমেদের কথার অধিকাংশ সংকলন করেছেন।[55]

وقال في موضع آخر: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة

وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اه وفي البزازية ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذطعاما للفقراء كان حسنا اه وأطال في ذلك المعراج وقال وهذه

---

54 ইমাম নুরুদ্দীন আলী ইবনু গানিম আল-মাক্দিসী আল-হানাফী। মৃত্যু:১০০৪ হিজরী (কাশফুয যুনুন:১/৮৪০)। সালাতুর রাগাইব নামে সালাতের বিদ‘আত সম্পর্কে তার লিখিত কিতাবের নাম, ردع الراغب عن الجمع في صلاة الرغائب

55 রাদ্দুল মুহ্তার, কিতাবুস সালাত, বিতর ও নফল অধ্যায়, ২/২৬

الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اهـ (رد المحتار:ج:٢ص:٢٤٠)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, আর মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে যিয়াফত খাবারের আয়োজন করা মাকরূহ। কেননা তা আনন্দের বেলায় শরীয়ত সম্মত, অনিষ্টতার বেলায় নয়। আর এটা মন্দ বিদ‘আত। ইমাম আহমদ এবং ইবনে মাজাহ বিশুদ্ধ সনদে জারীর ইবন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন,[56] জারীর বলেন, ‘‘মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা নিয়াহাহ (বিলাপ) গণ্য করতাম’’। বায্যাযিয়ায় রয়েছে, ‘‘আর মৃত্যুর প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, সপ্তাহ পর এবং অনুষ্ঠানে খাবারের আয়োজন করা, বিভিন্ন মৌসুমে কবরে খাবার নিয়ে

---

[56] ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ, মৃত ব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং খাবারের আয়োজন করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, হাদীস নং ১৬১২, ইবনে মাজাহ এর হাদীসটির শব্দ হলো:

كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং:৬৯০৫, মুসনাদে আহমদের শব্দ:

كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ

যাওয়া, কুরআন পড়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা এবং সৎ লোক ও ক্বারীদেরকে খতমের জন্য বা সূরা আন‘আম অথবা সূরা ইখলাস পড়ার জন্য সমবেত করা মাকরূহ। মোটকথা, কুরআন পড়ার সময় খাওয়ার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করা মাকরূহ'' এবং উক্ত কিতাবের ইসতেহসান অধ্যায়ে রয়েছে, ‘‘যদি দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের আয়োজন করে তবে ভাল''। আর মি‘রাজে[57] এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন, ‘‘এই সবগুলো হচ্ছে লোক দেখানো ও লোক শুনানো। তাই এ সব থেকে বিরত থাকবে, কেননা তারা এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে না''।)[58]

وقال في موضع آخر: وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندا إلى النقول الصريحة فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارىء وقال العيني في شرح الهداية ويمنع القارىء للدنيا والآخذ والمعطي آثمان فالحاصل أن ما شاع في زمانا من قراءة

---

[57] সম্ভবত আবুল ক্বাসিম আল-কুশাইরী নাইসাবুরী রচিত ‘কিতাবুল মি‘রাজ' উদ্দেশ্য।

[58] রাদ্দুল মুহতার, সালাত অধ্যায়, সালাতুল-জানাযা অনুচ্ছেদ, ২/২৪০।

الأجزاء بالأجرة لا يجوز لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون (وبعد أسطر) كما صرح به في التاتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارىء بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء (رد المحتار:ج:٦ص:٥٦)

(এবং তিনি আরেক জায়গায় বলেন, তাবয়িনুল-মাহারিমের লিখক[59] স্পষ্ট উদ্ধৃতির মাধ্যমে এসব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেন। তার বক্তব্যের মধ্য থেকে রয়েছে,“তাজুশ্-শরীয়াহ বলেন,[60] পারিশ্রামিকের মাধ্যমে কুরআন পড়া ছওয়াবের

---

[59] সিনানুদ্দীন ইউসুফ আল-আমাসী আল-হানাফী, আল-মক্কী, মৃত্যু: ১০০০ হিজরীর পাশাপাশি।

[60] আল-ইমাম তাজুশ-শরীয়াহ, আহমদ ইবন উবাইদুল্লাহ আল-মাহবুবী আল-হানাফী উমর ইবন সাদরুশ-শরীয়াহ আল-আওয়াল, মৃত্যু:৬৭২ হিজরী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘নিহায়াতুল কিফায়াহ ফি দিরায়াতিল হিদায়াহ। (কাশফুয-যুনুন ২/২০২২)

উপযুক্ত হয় না, না মৃতব্যক্তির জন্য, না পাঠকের জন্য"।
হেদায়ার ব্যখ্যাগ্রন্থে আইনি[61] লিখেন, "দুনিয়ার জন্য কুরআন পাঠককে বাধা দেওয়া হবে, দাতা, গ্রহিতা উভয়ে গোনাহগার হবে"। মোটকথা, আমাদের যুগে পারিশ্রমিকের মাধ্যমে কুরআনের অংশ পড়ার যে প্রচলন বিস্তার লাভ করেছে তা জায়েয নেই, কেননা এখানে পড়ার নির্দেশ এবং ছওয়াব নির্দেশদাতাকে দেওয়া রয়েছে, আর পড়া হচ্ছে অর্থের কারণে। অতএব বিশুদ্ধ নিয়্যাত না থাকার কারণে পাঠকই যখন ছওয়াব পাচ্ছে না তাহলে কী-ভাবে পাঠক নিয়োগকারীর কাছে ছওয়াব পৌছবে। যদি পারিশ্রমিক না থাকত তবে আজকাল কেউ কারো জন্য পড়ত না। বরং কুরআনকে তারা উপার্জনের বস্তু ও দুনিয়া সংগ্রহের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। (কয়েক লাইন পর) যেমন তাতারখানিয়ায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বলেন, "এই (খতমের) অসিয়্যাতের এবং পড়ার কারণে

---

[61] প্রখ্যাত হানাফী মুহাদ্দীস আবু মুহাম্মদ আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনি। ৭৬২৮৫৫ – হিজরী১৩৬১ - -১৪৫১ ঈসায়ী। তার লিখিত হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-বিনায়াহ'। দেখুন, বর্ণিত কিতাবের কারাহিয়্যাহ অধ্যায়, মাসাঈলু মুতাফার্রিক্বাহ, ১১/২৬৭।

পাঠককে দানের অসিয়্যাতের কোনো অর্থ নেই। কেননা এটা ভাড়া করার ন্যায়, আর এসবের বেলায় ভাড়া করা বাতিল এবং তা বিদ‘আত। খুলাফাদের মধ্যে কেউই এমন কর্ম করেননি।)[62]

١٠- وقال ايضا: ونقل العلامة الحلواني في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك وقد قال العلماء إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة (وبعد اسطر) وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لاينكرها إلا من طمست بصيرته وقد جمعت فيها رسالة سميتها (شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل) (رد المحتار: ج:٦ص:٥٧)

---

[62] রাদ্দুল-মুহতার, কিতাবুল ইজারাহ, মাতলাবুন ফিল-ইসতিজার আলাত্‌-ত্বা‘আত, : ৬/৫৬।

(তিনি আরো বলেন, আল্লামা হুলওয়ানী 'আল-মুনতাহাল হাম্বলী'[63] এর টিকায় শায়খুল ইসলাম তাক্বী উদ্দীন থেকে বর্ণনা করেন যার ভাষ্য হলো, "পড়ার জন্য পারিশ্রমিকের উপর নিয়োগ দেওয়া এবং এর ছওয়াব মৃতব্যক্তিকে পাঠানো শুদ্ধ নয়, কেননা কোনো ইমাম থেকে এর অনুমোদন পাওয়া যায় না। বরং আলেমগণ বলেন, নিশ্চয় ক্বারী যখন সম্পদের কারণে পড়বে তখন তার কোনো ছওয়াব নেই, অতএব সে মৃতব্যক্তির কাছে কি জিনিস পাঠাবে, মৃত ব্যক্তির কাছে কেবল সৎকর্মই পৌঁছে। আর শুধুমাত্র তেলাওয়াতের উপর পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা কোনো ইমাম বলেননি"।

(কয়েক লাইন পর) অতএব, এখন তোমার কাছে খতম এবং তাহালিলের অসিয়্যাত, যে দিকে মানুষ ঝুঁকেছে তার অন্যান্য খারাবীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া ছাড়াই তা বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। দৃষ্টিশক্তি লোপ

---

[63] ফিক্বহে হাম্বলীতে রচিত কিতাব, মূল নাম 'মুনতাহাল-ইরাদাত ফিল জাম্'ঈ বাইনাল মুক্বান্না'ঈ ওয়াত্-তানক্বীহি ওয়ায্-যিয়দাত', লেখক, তাক্বীউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আব্দুল আযিয ইবনুন্-নাজ্জার আল-ফুতুহী আল-মিসরী, মৃত্যু: ৯৭২ হিজরী।

করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ছাড়া যার খারাবী কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমি এতে একটি পুস্তিকা সংকলন করেছি যার নাম দিয়েছি ‘শিফাউল-আলীল ও বাল্লু-গালীল ফি হুকমিল-অসিয়্যাতে বিল-খাতামাতে ওয়াত্তাহালীল’[64]

এসমস্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রচলিত কুরআন খতম বিদ‘আত এবং না-জায়েয। কুরআন, হাদীস এবং কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে এর কোনো প্রমাণ নেই। এতে অংশ নেওয়া জায়েয নয়। এছাড়া প্রচলিত খতমে কুরআনে আরো অসংখ্য খারাবী রয়েছে যার কিছু নিম্নে তুলে ধরছি:

1. ঘোষণা এবং বলপূর্বক এতে লোকজনদের সমবেত করা হয়, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় “তাদাঈ” (ডাকাডাকি) বলা হয় যা নফল ইবাদতে নিষিদ্ধ। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে কিছু মানুষ সালাতুদ্দোহা জামাতের আকারে পড়ছিল, যখন তার কাছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো

[64] রাদ্দুল মুহতার, প্রাগুক্ত অধ্যায়:৬/৫৭।

তিনি তাদের আমলকে বিদ‘আত আখ্যা দিলেন। অথচ সালাতুদ্দোহা একাকি পড়া প্রমাণিত। এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এক গোত্রের ব্যাপারে শুনলেন, তারা উচ্চস্বরে তাহলিল এবং দুরূদ পড়ছে, তখন তিনি তাদেরকে বিদ‘আতি বলে মসজিদ থেকে বের করে দিলেন। অথচ একাকি তাসবীহ, তাহলীল এবং দুরূদ পড়া পূণ্য ও ছওয়াবের কাজ।

2. ডাকার পর যদি কিছু মানুষ কুরআন খতমে না আসে তাহলে তাকে বিভিন্নভাবে তিরস্কার করা হয়। অথচ মুস্তাহাব কাজ ছাড়ার উপর তিরস্কার জায়েয নেই।

3. অনুপস্থিতদের ব্যাপারে মনে বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ বদ্ধমূল করা হয়।

4. কুরআন খতমের আয়োজকরা বেশি লোকের উপস্থিতিতে গর্ব করে।

5. প্রচলিত কুরআন খতম এত জরুরী মনে করা হয় যে, যদি কোনো মানুষ কুরআন খতম না করায় অথবা তার খতমের আয়োজনে মানুষ কম হয় তবে সে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

6. পুরো কুরআন খতম জরুরী মনে করা হয়, অথচ শরীয়তে বরকত এবং ছওয়াবের জন্য কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া যিকর আযকার, তাসবীহাত, নফল এবং সাদাকাত ইত্যাদি অন্যান্য পদ্ধতিতেও এই উদ্দেশ্য অর্জন হয়।

7. যদি পড়ার জন্য মানুষ কম জমা হয় তখন তার পুরো কুরআন খতমকে নিজের উপর চাপ এবং বিষের ঢোক মনে করে যে কোনভাবে তা গলা থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে,

(اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه)

(صحيح بخاري:ج:٢ص:٧٥٧)

অর্থাৎ (ঐ সময় পর্যন্ত কুরআন পড় যতক্ষন মনে বিরক্তিবোধ না হয় এবং যখন ক্লান্ত হয়ে পড় তখন ছেড়ে দাও)[65]

৮. এই অবস্থায় তাজবীদের নিয়ম কানুন, হুরূফের সিফাতের বিশুদ্ধ আদায়, গুন্নাহ, ইখফা, ইজহার এবং

---

[65] সহীহুল বুখারী, অধ্যায়: কুরআনের ফযিলত সমূহ, অনুচ্ছে: যতক্ষন মন চায় ততক্ষন কুরআন তেলাওয়াত করা। নং: ৪৭৭৩।

মদসমূহের প্রতি খেয়াল করা ব্যতীত শব্দ ও অক্ষর কেটে প্রাণ পরিত্রাণের চেষ্টা করা হয়।

9 প্রচলিত কুরআন খতমে এমন লোক আসে যে কুরআন পড়া জানে না। তখন সে কুরআন হাতে নিয়ে প্রত্যেক লাইনে বিসমিল্লাহ পড়ে অথবা শুধু আঙ্গুল ফিরিয়ে পারা রাখা দেয়। একে আঙ্গুল এবং বিসমিল্লাহ খতম বলা হয়, শরীয়তে যার কোনো প্রমাণ নেই। বরং এতে কুরআনের অবমাননা।

10 খতমের শেষ পর্যন্ত বসাকে জরুরী মনে করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি নিজের পারা শেষ করে কঠিন প্রয়োজন সত্ত্বেও উঠার সাহস করে না। কেননা এটাকে অত্যন্ত দোষনীয় মনে করা হয়।

11 কোনো কোনো মানুষের তেলাওয়াতে সেজদার জ্ঞান থাকে না, ফলে সে সেজদার আয়াত পড়ে এবং শোনে তেলাওয়াতে সেজদা না করার কারণে নেকীর পরিবর্তে ওয়াজিব ছাড়ার গোনাহ নিজের মাথায় বহন করে।

12 কোনো কোনো জায়গায় কুরআন খতমের আয়োজক সবার পক্ষ থেকে চৌদ্দ সাজদা আদায় করে নেয়। এতে

পাঠকদের দায়িত্ব আদায় হয় না এবং শরীয়ত বিরোধী কাজের কারণে সাজদাকারী গোনাহগার হয়।

13 প্রচলিত কুরআন খতমে মিঠাইর ব্যবস্থা করা হয়। "প্রচলিত নিয়ম শর্তের ন্যায়" মূলনীতির আলোকে এটা পাঠকদের পারিশ্রমিক, আর কুরআন পড়ার পারিশ্রমিকের দাতা, গ্রহিতা উভয় গোনাহগার। তাহলে এখানে নেকীর কী প্রত্যাশা করা যায়? আর যেখানে পাঠকের নিজের ছওয়াব হচ্ছে না, সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য তার ঈসাল কিভাবে হতে পারে ?

14 দাওয়াত বা মিঠাইকে এমন জরুরী করে রাখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর ব্যবস্থা করে না তার উপর অভিশাপ ও তিরস্কারের ঝুড়ি পড়ে।

15 প্রচলিত কুরআন খতমের জন্য তিনদিনা, চল্লিশা ইত্যাদি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা হয়। আর অনির্দিষ্ট ইবাদতের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দিন নির্দিষ্ট করা মাকরূহ, না-জায়েয বরং বিদ'আত।

16 জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

" كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ".

“মৃতব্যক্তির পরিবারে সমবেত হওয়া এবং তারা খাবারের আয়োজন করাকে আমরা ‘নাওহা’[66] (বিলাপ) গণ্য করতাম” আর বিলাপ করা হারাম।

17 প্রচলিত কুরআন খতমে অংশগ্রহণকারী এবং যিনি অংশগ্রহণ করান সবার উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো। লোকদেখানোর কারণে মানুষের বড় বড় আমল নষ্ট হয়ে যায়।

হাদীসে রয়েছে লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে[67]

---

[66] ‘নাওহা’ বা ‘নিয়াহাহ’, অর্থাৎ বিলাপ করে মৃত ব্যক্তির উপর ক্রন্দন করা। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কেউ মারা গেলে বিলাপ করে ক্রন্দনের প্রচলন ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কর্মকে জাহেলী কর্ম আখ্যা দেন এবং তা হারাম ঘোষণা করেন। দেখুন, বুখারী, ‘মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ মাকরূহ অধ্যায়’। সহীহ মুসলিম, নিয়াহার উপর কঠোরতা অধ্যায়। বুখারীর একাধিক অধ্যায়ে এ বিষয় সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[67] লোকদেখানো আমলকে শরয়ী পরিভাষায় ‘রিয়া’ বলা হয়। কুরআন হাদীস উভয়ের মাধ্যমে ‘রিয়া’ হারাম প্রমাণিত। হাদীসে ‘রিয়া’কে শিরকে আসগর বা ছোট শিরক গণ্য করা হয়েছে। ‘রিয়া’ হারাম বা কবীরা গোনাহের অন্যতম এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে লেখক এখানে হাদীসে রয়েছে বলে যে কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ “লোক দেখানো আমলকারীর আমল এমন ধ্বংস হয় যেমন আগুন লাকড়ি খেয়ে ফেলে” এই মর্মের কোনো হাদীস রয়েছে বলে অবগত

এবং আল্লাহর কাছে এমন আমল প্রত্যাখ্যাত। অতএব যে আমলটি আল্লাহর জন্য করার ছিল, বরকত এবং ছওয়াব পৌছা উদ্দেশ্য ছিল, লোকদেখানোর কারণে সমস্ত আমলে আগুন লেগে গেছে। ছওয়াব কি মিলবে? উল্টো লোকদেখানোর আযাব মাথার উপর আসলো।

এই সমস্ত খারাবী শরীয়ত এবং সুন্নাত থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেওয়ার ফলাফল। এর বিপরীত যদি শরীয়তের পদ্ধতি অবলম্বন করা হত তাহলে আরাম হত। এত কষ্ট উঠাতে হত না। ইখলাসের সহিত ও আল্লাহর জন্য হত। যার বদলে পাঠক ছওয়াব পেত। মৃত ব্যক্তির কাছেও ছওয়াব পৌছত। লোক দেখানো মারাত্মক গোনাহও মাথায় নিতে হত না।

ঈসালে ছওয়াবে সঠিক পদ্ধতি

ঈসালে ছওয়াবের সঠিক পদ্ধতি এই যে, মৌখিক এবং শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ ঘরে একাকীভাবে যে ইবাদত করে, নফল নামায পড়ে, নফল রোজা রাখে, তাসবীহ আদায় করে, তেলাওয়াত করে,

---

হতে পারিনি। (সংকলক)

নফল হজ্ব বা উমরা করে, তাওয়াফ করে এগুলোতে শুধু এই নিয়্যাত করে নিবে যে, এর ছওয়াবটুকু আমাদের অমুক দোস্তের কাছে পৌঁছুক। তা পৌঁছে যাবে। এটাই হচ্ছে ঈসালে সওয়াব। যে ছওয়াবটুকু তোমার নিজের পাবার কথা তা তোমার জন্য অর্জিত হয়ে যাবে এবং যে সমস্ত লোকদের নিয়্যাত করা হয়েছে তারাও এর পুরো ছওয়াব পেয়ে যাবে।[68]

---

[68] আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ ঈসালে ছওয়াবের বেলায় দুই ভাগে বিভক্ত। একদল কুরআনের আয়াত,"وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى " অর্থাৎ: আর মানুষের জন্য তার চেষ্টা ব্যতীত কোনো কিছু নেই, (সূরা নাজম:৩৯) এই মর্মের আয়াত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له"

"মানুষ যখন মারা যায় তখন তাঁর তিনটি আমল ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকায়ে জারিয়াহ, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।" (তিরমিযী, হাদীস সহীহ, ওয়াক্বফ অনুচ্ছেদ, নং:১৩৭৬) এই হাদীসের আলোকে তারা বলেন: হাদীসে উল্লেখিত তিন বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুর ঈসাল হয় না। কেননা; হাদীসে তিন বস্তু ছাড়া সব আ'মাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা এসেছে। আর এ তিনটি মূলত তার নিজের চেষ্টার ফসল। সুতরাং এই হাদীস আর আয়াতে কোনো বিরোধ নেই। তবে সাদাকা

আর্থিক সাদাকা খায়রাতের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, নিজের সামর্থানুযায়ী নগদ অর্থ কোনো কল্যাণমূলক কাজে লাগিয়ে দিবে অথবা কোনো মিসকিনকে দিয়ে দিবে।

এই পদ্ধতি এ জন্য উত্তম যে, এতে মিসকিন নিজের প্রয়োজন পুরা করতে পারে। যদি আজ তার কোনো প্রয়োজন না হয় তবে কালকের জন্য রাখতে পারে। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটি লোকদেখানো হতে মুক্ত। হাদীসে গোপনে সাদাকাকারীর এই ফযিলত বর্ণিত হয়েছে যে,

---

যেহেতু শারীরিক ইবাদত নয়, জীবিত ব্যক্তিকে তা দেওয়া যায়, তার পক্ষ থেকে অন্যকে দেওয়া যায়, মৃত্যুর পরও তার পক্ষ থেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু শারীরিক ইবাদত কাউকে দেওয়া যায় না তাই তার ঈসাল ও নেই। তবে শারীরিক কিছু ইবাদত যার ঈসাল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো মানসুস হওয়ার কারণে তা এই কায়দা থেকে মুসতাসনা বা ব্যতিক্রম থাকবে। এই দল আলেমদের মতে কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু একটি শারীরিক ইবাদত তাই তার ঈসালই হবে না, কেননা এব্যাপারে কোনো নস নেই। আর ইবাদতে বিষয় গাইরে মা'কুল, তাই আমরা তাকে অন্য ইবাদতের উপর ক্বিয়াস করতে পারি না। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অপরদল মনে করেন, যে কোনো ইবাদতের ঈসাল হতে পারে। আমাদের লেখক এমতের প্রবক্তা হিসেবে কুরআন তেলাওয়াতের ঈসালের সঠিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন।

এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে নিজের রহমতের ছায়ায় জায়গা দিবেন, যখন আর কোনো ছায়া থাকবে না এবং গরমের কারণে মানুষ ঘামে ডুবে যাবে।

ফযিলতের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির সাদাকা হচ্ছে, মিসকিনের প্রয়োজন অনুসারে তাকে সাদাকা করবে। অর্থাৎ প্রয়োজন দেখে তা পুরা করবে।

ঘর ও দোকানের বরকতের জন্যও মালিক নিজে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করবে।

والله سبحانه وتعالى أعلم

১৪ রবিউল আওয়াল ১৪১৭ হিজরী।

পাঠক, এই হলো উনার বক্তব্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উনার লেখায় অসংখ্য কিতাব ও ফকীহের বক্তব্য ও তথ্য রয়েছে। এই লেখা পড়ার পর আশা করি সত্যসন্ধানী আলেমের জন্য বিষয়টি বুঝতে কোনো সমস্যা পেতে হবে না। একমাত্র পেটপূজারী আলেম ছাড়া কেউই হিলার বাহানা তালাশ করে উনার লিখার বিরুদ্ধে কলম ধরবেন না। শরীয়তে বৈধ বা হালাল থাকা এক কথা, আর বৈধ বানানো আরেক কথা। কুরআন হাদীসে কোনো জিনিসের বৈধতা

থাকা এক কথা, কুরআন হাদীস দিয়ে বৈধ বানানো আরেক কথা। তবে প্রথমটি আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের গুণ। আর দ্বিতীয়টি গুমরাহ পেটপূজারী আলেমদের গুণ। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য একটি উপমা পেশ করছি। যেমন ধরুন, রাসূল আলিমুল গাইব নন বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি বলছেন রাসূল আলিমুল গাইব নন, তার দলীল কুরআন ও হাদীসের একাধিক জায়গায় রয়েছে। পক্ষান্তরে যে আলেম দাবী করছেন রাসূল আলিমুল গাইব, তিনি কুরআন হাদীস থেকেই তার মতের স্বপক্ষে দলীল দিচ্ছেন। তবে তার দাবীর পক্ষে কোনো দলীল কুরআন বা হাদীসে নেই। তিনি কিছু দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসকে তার মতের পক্ষে দলীল বানাচ্ছেন। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলেম ছাড়া কেউই প্রচলিত খতমে কুরআনের স্বপক্ষে ওকালতি করতে পারেন না, কেননা এসবের অস্তিত্ব কুরআন, হাদীস, সাহাবা জীবনে নেই, এমনকি খাইরুল কুরুন তথা সোনালী প্রজন্ম (রাসূল, সাহাবা ও তাবে‘ঈ) এর কোনো যুগেও এর অস্তিত্ব খোঁজে পাবেন না।

প্রচলিত খতমের অস্তিত্ব খাইরুল কুরুনে না থাকায় বিষয়টি বিদ‘আত হওয়ার সাথে সাথে লেখক আরো অনেক খারাবী তুলে ধরেছেন, যা উনার অভিজ্ঞতার আলোকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে

উল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরো যে সমস্ত খারাবী রয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরছি। এই অভিজ্ঞতা সবার নাও থাকতে পারে। আমি অধমের কাছে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কয়েকটি উল্লেখ করব।

1. পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি। মনের হিংসার জ্বালা প্রকাশ্যে রুপ নিতে অনেকের বেলায় দেখা গেছে। যেমন, একজন কোথাও দশজন নিয়ে যাওয়ার কথা। বাস্তবতা হলো, দশজন হলে এক প্রতিষ্ঠানের সবাইকে খতমের তালিকায় রাখা সম্ভব নয়। এ থেকেই হিংসা ও সমালোচনার সুত্রপাত। যা খতমের দু একদিন পর্যন্ত বা আরো বেশি চলতে থাকে।

2. অন্যের মনে জ্বালা সৃষ্টির জন্য অযথা ঠাট্টাস্বরূপ খতমের কথা বলা। অথচ হাদীসের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা কাজে হোক বা ঠাট্টায় হোক সর্বাবস্থায় হারাম। সাধারণ নিমণ শ্রেণির উস্তাদ নয় বরং অনেক শ্রদ্ধাভাজন আলেম যারা দাওরায়ে হাদীসে পড়ান তাদের অনেকের কাছ থেকেও এ সব আচরণ পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

3. মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। যেমন অনেক সময় খতম না করেই খতমের আয়োজককে মিথ্যা বলা।

4. কুরআনের সাথে ব্যবসায়িক পণ্যের মত লেনদেনের আচরণ করা এবং কুরআন নিয়ে বেয়াদবীমূলক কথা বলা। যেমন, অহরহ একথা বলতে শুনা গেছে, সিলেটি ভাষায় 'যেলা পয়সা ওলা খতম' অর্থাৎ টাকা হিসেবে খতমের মান নির্ণয় করা হয়। অনেককে আগেই 'কয়টেকি খতম' অর্থাৎ কত টাকার খতম, একথা বলতে শুনা যায়। এভাবে টাকার উপর কুরআন পড়ার মান নির্ণয় করা কুরআনের সাথে কতটুকু বেয়াদবী? তা পাঠক নিজেই বলুন। অসতর্কতায় আমার মুখ থেকেও দু-একদিন এমন কথা বের হয়েছে। আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আবারো করছি, তিনি যেন আমাকে মাফ করেন।

5. কুরআন সামনে নিয়ে হাসি, তামাশা, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে তেলাওয়াত করা। আয়োজক সামনে থাকলে তার ভয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়া। এ থেকে স্পষ্ট যে, টাকাই প্রচলিত খতমের মূল টার্গেট।

6. টাকাই যে মূল টার্গেট তা সবার মনে জানা রয়েছে। সবার আচরণে একথা স্পষ্ট। মূল টার্গেট টাকা থাকাবস্থায় আল্লাহর কাছে এসব খতমের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, আলেম বলতেই একথা জানেন। একথা জানা থাকা সত্বেও নিজের পেট পালার তাগিদে দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়া। তাকে রাসূলের শিক্ষার আদেশ না দিয়ে খতমের কথা বলা, অথবা

নিজ থেকে না বললেও তাকে তার অজ্ঞতার উপর রাখা। সঠিক সুন্নাতের দিশা না দেওয়া। অথচ সঠিক ইলম প্রকাশের সুযোগ থাকা সত্বে তা গোপন রাখা অবৈধ। হাদীসে এর উপর ধমকি এসেছে।

এছাড়া সমাজিকভাবে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা আলেমদের জন্য লজ্জাজনক ও তাদের মান সম্মানে আঘাত, এই খতমকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

আহসানুল ফাতওয়ার লিখাটি অনুবাদ করার পর এ বিষয়ে নিজ থেকে কিছু লিখার প্রয়োজন ছিল না। যা নিজেই পূর্বে উল্লেখ করেছি, তথাপি দু-একটি কথা না লিখে পারলাম না। আল্লাহ প্রথমে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে হেদায়াতের উপর পরিচালিত করুন। সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

খতমে ইউনুস

ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী। আল্লাহর নির্দেশের পূর্বে তিনি তাঁর গোত্র থেকে হিজরত করে চলে যান। আল্লাহর কাছে তাঁর এ কাজ অপছন্দনীয় হলে ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের পেটে যেতে হয়। যার বিবরণ কুরআন পাকে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কমবেশ আমাদের সবারই ঘটনাটি জানা আছে। বিপদে পড়ে যে কেউ নিজের গোনাহের স্বীকারোক্তি বা তওবা করে আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ডাকলে আল্লাহ তাঁর ডাক শুনেন। ইউনুস আলাইহিস সালামের মাছের পেটে পড়ার বিপদ থেকে উদ্ধারের এই কাহিনিটি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে এই খবরটি দেন। উদ্ধারের কাহিনিটি আল্লাহ যেভাবে উল্লেখ করেন তাতে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা কয়েকজন নবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেন,

﴿ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة الأنبياء: ٨٧-٨٨)

“আর আপনি মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে আটকাবো না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করে বললেন, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি গোনাহগার। অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম। এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে মুমিনদের মুক্তি দিয়ে থাকি”।১[69]

এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? একটু চিন্তা করলেই যে কেউ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে। অর্থাৎ যে কোনো বিপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনই একজন মুমিনের করণীয়। সকাতরে আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাঁর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিবেন।

এবার আমরা দেখি হাদীসে এ দো‘আর ব্যাপারে আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

" دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في

---

[69] সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮।

شيء قط إلا استجاب الله له". (سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ٨٢ ، رقم: ٣٥٠٥، مسند احمد، مسند سعد بن أبي وقاص، رقم: ١٤٦٢)

“মাছওয়ালা যখন মাছের পেটে থাকাবস্থায় দো‘আ করেছিলেন তখন তার দো‘আ ছিল,

لا إِلَهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি দোষমুক্ত, নিশ্চয় আমি গোনাহগার) অতএব যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এর মাধ্যমে দো‘আ করেছে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।”[70]

কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে যে বিষয়টি উপলব্ধি হয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। সাধারণ ব্যক্তিও চিন্তা করলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। কুরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝলাম, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বিপদে পড়লে এই দো‘আটি করতে পারে। এই দো‘আ

---

[70] তিরমিযী, সুনান, হাদীস সহীহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আ অধ্যায়, ৮২ নং অনুচ্ছেদ, হাদীস নং: ৩৫০৫, আলবানী, তিরমিযির সহীহ ও দয়ীফ, ৮/৫, মুসনাদে আহমদ, সা‘দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাদীস, নং:১৪৬২।

করলে আল্লাহ তাকে বিপদ মুক্ত করবেন বলে আমরা পূর্ণ আশাবাদী হতে পারি। কিন্তু কে বা কারা প্রথমে কুরআন হাদীসের এই শিক্ষার পরিবর্তন ঘটিয়ে খতমে ইউনুস নামে খতম আবিষ্কার করেছে তার ইতিহাস আমাদের কাছে না থাকলেও অভিজ্ঞতার নামে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত চলছি। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার প্রচার না করা কতটুকু আমানতদারী তা প্রশ্নযোগ্য। বিবেকের কাছে কি আমরা কখনো প্রশ্নের সম্মুখীন হই না? না কি পেটের তাগিদে আমাদের বিবেকই নষ্ট হয়ে গেছে?

এই খতমের বিবরণ যেভাবে দেওয়া হয়েছে:

‘‘কঠিন বিপদ মামলা-মোকাদ্দমা ও সঙ্কটের সময় এই দো‘আ সোয়া লক্ষ বার পড়িবে। প্রত্যেক একশতবার পড়া হইলে শরীর বা মুখে পানি দিবে। পাক অবস্থায় পাক বিছানায় বসিয়া কেবলামুখী হইয়া পড়িবে। ৩,৭ কিংবা ৪০ দিনে শেষ করিবে। মাছের পেটের ভিতর অন্ধকারের এই দোয়া জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া অন্ধকারে বসিয়া পড়িলে আরও সত্বর ফল লাভ হয়। খতম শেষ হইলে একবার এই আয়াত পড়িবেঃ

{ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(الانبياء: ٨٨) }

উচ্চারণঃ ফাসতাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনীন। (১৭ পারা, সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৮৮)

অর্থঃ "তৎপর আমি তাঁহার (হযরত ইউনুস নবীর) দোয়া কবুল করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং এইরূপে আমি বিশ্বাসীগণকে উদ্ধার করিয়া থাকি।" এই তাদবীরকে খতমে ইউনুস বলা হয়। ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও অব্যর্থ ফলপদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।"[71]

এখানে আমরা কুরআন হাদীসের শিক্ষার সাথে দুই ধরণের বৈপরীত্য দেখতে পাই।

[71] নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১২০।

এক: নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারটি। যা কুরআন হাদীসের শিক্ষার বিপরীত।

দুই: বিপদে যিনি পড়েন তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে দো'আটি না পড়ে অন্যকে দিয়ে পড়ানো। যার কোনো শিক্ষা কুরআন বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে আমরা পাই না। সবচেয়ে হাসির ব্যাপার হলো, বিপদে পড়লাম আমি, আর আরেকজনকে এনে তাকে দিয়ে দো'আ পড়াচ্ছি, সে তার দো'আয় বলছে 'নিশ্চয় আমি গোনাহগার' আমি বিপদে পড়ে অন্যকে গোনাহগার বলানোর মাধ্যমে আমার নিজের কী লাভ?

একটু ভেবে দেখলাম না। একদিন একজন সাধারণ মানুষ আমাকে কথাটি বলে হাসিয়ে দিয়েছেন। আলেম না হয়েও তার এই উপলব্ধি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং নিজেকে ধিক্কার দিলাম এই বলে যে, বুঝেও কেন এতে জড়িত রয়েছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন।

এভাবে এসব খতমের মাধ্যমে সমাজে 'পুরোহিততন্ত্র' চালু হয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে সুন্নাত সম্মত দো'আ পড়ে মনের আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদবে এবং বিপদমুক্তি প্রার্থনা করবে। নেককার মানুষের কাছে

দো‘আ চাওয়া যাবে। তিনি তার মত করে তার জন্য দো‘আ করবেন।

অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বৈধ করা

এসব খতম বৈধ করার স্বার্থে অভিজ্ঞতার কথা বলে ফতোয়া চালিয়ে দিতে দেখা যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার বিপরীত কার অভিজ্ঞতা বা কার কথার এত মূল্যায়ন যা রাসূলের শিক্ষাকেও হার মানায়? আর যিনি এ নির্দিষ্ট সংখ্যার অভিজ্ঞতার কথা বললেন, তিনি নিজে পড়ার কথা বললেন, না কি অন্যকে দিয়ে পড়ানোর? যাই হোক এর কোনটিই যেহেতু রাসূলের শিক্ষা নয় তাই আমরা এ সবের পিছনে পড়ার প্রয়োজন বোধ করি না। এ সব কথাবার্তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এতে করে শরীয়ত পরিবর্তন হয় বলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করছি। যেমন ধরুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে আমরা জানি, সাদাকা বা দানের মাধ্যমে বালা মুসিবত দূর হয়। এবার মনে করুন কোনো ব্যক্তি কোনো এক তারিখের নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন সে শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টোর সময় ১০ টাকা দান করল। আল্লাহর অনুগ্রহে তার একটি মুসিবত দূর হলো। আমরা বলতে পারি এই সাদাকার ওসীলায় হয়ত আল্লাহ

তাঁর মুসিবত দূর করেছেন। কেননা সাদাকায় মুসিবত দূর হয় বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা পেয়েছি। এমন কয়েকবার হলে সে বলতে পারে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে সাদাকায় মুসিবত দূর হয়। কিন্তু এ দানকারী লোকটি যদি বলে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয় তাই সবাই দশ টাকা দান করাকে আমল বানান। আরেকটু এগিয়ে যদি বলে, শাওয়াল মাসে দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরো বাড়িয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ দশ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়, আরেকটু এগিয়ে যেমন, শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ শনিবার বিকাল ৫টোর সময় ১০ টাকা দান করলে মুসিবত দূর হয়। তাই সবাই এভাবে আমল করুন। তাঁর এই কথাগুলো একেবারে মুর্খ ছাড়া কেউ গ্রহণ করবেন বলে জানি না। যদিও সে তার আমলের ফলাফল এভাবে পেয়েছে। কিন্তু তার এই অনুভূতি রাসূলের শিক্ষা বিবর্জিত। এতে শরীয়তের মূল শিক্ষা পরিবর্তন হয়, তাই তার অনুভূতি কখনো গ্রহণ করা যায় না বা অভিজ্ঞতার নাম দিয়ে এ ধরণের আমল শুরু করা যায় না। এবার এর আলোকে আমরা ‘খতমে ইউনুস’ নামের খতমের কথাটি চিন্তা করি। আশাকরি এসবের অসারতা বুঝতে আর কারো কোনো দ্বিধা থাকবে না।

এতো হলো খতমের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন থেকেই খতমকে কেন্দ্র করে অন্যান্য খারাবী ও নাজায়েযের সুচনা। যে কোনো সুন্নাতকেই তার স্বাভাবিক অবস্থা তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমলের রূপরেখা থেকে সরিয়ে দিলে সুন্নাত নিমজ্জিত হওয়ার সাথে সাথে আরো অনেক নাজায়েয যোগ হয়। যার অনেকটা আমরা ইতোপূর্বে খতমে কুরআনের শেষে উল্লেখ করেছি। অধিক সংখ্যক পড়া নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, খতম পাঠকারী হুজুর ও খতমের আয়োজকের মাঝে সন্দেহ, মন কষাকষির সৃষ্টি হওয়া, টাকার পরিমাণ হিসেবে খতমের সংখ্যায় কমবেশ করা, আলেমদের সাথে জাহেলের বেয়াদবীমূলক আচরণ ইত্যাদি। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার ভান করে অনেক শ্রদ্ধাভাজন আলেমকে তাঁর সম্মান বা নিজ অবস্থানের অনেক নিচে নামতে দেখা যায়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এ সব থেকে পরিত্রাণ দান করুন এবং হুবহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীক্বার উপর চলার তওফিক দান করুন।

❁❁❁❁❁

খতমে বুখারী

মুমিন ব্যক্তির জীবনে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস ছাড়া মুমিন তাঁর ইসলামী জীবন কল্পনা করতে পারে না। কুরআন হাদীস উভয় মিলেই তাঁর জীবন পরিচালিত। তাই কুরআনের মতই হাদীস শিক্ষা করা, হাদীস চর্চা করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মুমিনের জন্য জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয। আর কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে মুসলিমের মূল জ্ঞান ভাণ্ডার। এই হাদীস শিক্ষা, চর্চা, মুখস্থ রাখা, সংরক্ষণ করা ও প্রচার প্রসারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে উম্মতের একদল আলেম তাদের জীবনের পুরো অংশটিই ব্যয় করে দিয়েছেন। যাদের মেহনত, শ্রমের বদৌলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه».

(سنن أبي داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم، رقم: ٣٦٦٢، سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الحث على تبليغ السماع، رقم: ٣٦٥٦)

“আল্লাহ তাঁর চেহারাকে উজ্জল করুন যে আমার কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনল, অতঃপর সে তা সংরক্ষন করল, এমনকি তা অন্যের কাছে পৌছাল। অনেক ফিক্বহ (হাদীস) এর ধারক এমন রয়েছে, সে যার কাছে পৌছায় সেই ব্যক্তি তাঁর চেয়ে অধিক ফক্বীহ। আর অনেক ফিক্বহের ধারক নিজে ফক্বীহ নয়।”[72]

হাদীসটির মর্ম হচ্ছে, অনেক সময় এমনও হয় যে, যার কাছে পৌছানো হয় সে হাদীসের মর্ম বা ভাব যিনি পৌছিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বুঝেন। আবার এমনও অনেক রয়েছেন যিনি শুধুমাত্র হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পেরেছেন কিন্তু তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি, হতে পারে যার কাছে পৌছাবেন তিনি এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসকে বেশি বেশি পৌছানো ও প্রচারের দিকে উৎসাহিত করেছেন।

উলামায়ে কেরামের এই দল উক্ত হাদীসের পুরোপুরি হক্ব আদায় করার চেষ্টা করেছেন।

---

[72] আবু দাঊদ, সুনান, ইলম অধ্যায়, ইলম প্রচারের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৩৬৬২, তিরমিযী, সুনান, অধ্যায়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত ইলম, পরিচ্ছেদ: শ্রবণকৃত প্রচারের উৎসাহ, নং:৩৬৫৬, হাদীস সহীহ।

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলার দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া গেলেও সাধারণত কেউই সে সময় তাঁর নামে মিথ্যা কথা বলার সাহস পেত না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মিথ্যা বানিয়ে বলা শুরু হয়। মুনাফেক, ফাসেক্ব, স্বার্থান্বেষী তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলের নামে মিথ্যা বানিয়ে বলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে সরলমনা মুসলিমদের ধোকা দেওয়া সহজ ছিল। কিন্তু হাদীস গ্রহণে সাহাবিদের সতর্কতা ও যাচাইয়ের কারণে তা তাদের মধ্যে খুব প্রসার লাভ করতে পারে নি। প্রখ্যাত তাবিয়ী মুজাহিদ (রহ.)[73] বলেন:

"جاء بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لى لا أراك تسمع لحديثى أحدثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله -صلى الله

---

[73] বিশিষ্ট মুফাসসির তাবিয়ী মুজাহিদ ইবন জাবর আবুল হাজ্জাজ মক্কী, ২১-১০৪ হিজরী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে তাফসীর শিক্ষা লাভ করতেন। (আল-আ'লাম: ৫/২৭৮)

عليه وسلم- ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف". (صحيح مسلم، مقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء، ١-١٠)

“(তাবিয়ী) বুশাইর আল-আদাবী ইবনে আব্বাসের (রা) কাছে আগমন করেন এবং হাদীস বলতে শুরু করেন। তিনি বলতে থাকেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) তার দিকে কর্ণপাত করলেন না। তখন বুশাইর বলেন: হে ইবনু আব্বাস, আমার কি হলো! আমি আপনাকে আমার হাদীস শুনতে দেখছি না? আমি আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি কর্ণপাত করছেন না!? তখন ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: একসময় ছিল যখন আমরা যদি কাউকে বলতে শুনতাম: ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন’, তখনই আমাদের দৃষ্টিগুলো তাদের দিকে আবদ্ধ হয়ে যেত এবং আমরা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর প্রতি কর্ণপাত

করতাম। কিন্তু যখন মানুষ খানাখন্দক ভালমন্দ সব পথেই চলে গেল তখন থেকে আমরা আর শুধুমাত্র সুপরিচিত ও পরিজ্ঞাত বিষয় ব্যতীত মানুষদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করি না।"[74]

মুসলিম উম্মাহর ভিতরে মিথ্যাবাদী হাদীস বর্ণনাকারীর উদ্ভব হবে বলে নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক করেন। তার থেকে কিছু শুনেই যাচাই ছাড়া নির্বিচারে গ্রহণ করা, বর্ণনা করা থেকে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ আরোপ করেন। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনে:

« سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ » (صحيح مسلم، المرجع السابق)

"শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের

---

[74] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, দুর্বলদের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা নিষেধ অনুচ্ছেদ, ১/১০।

পিতামহগণ কখনো শুনেন নি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে, তাদের থেকে দূরে থাকবে।"[75]

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع »

"একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[76]

এভাবে অগণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন।

একদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী, অপরদিকে জালিয়াতদের জালিয়াতী উম্মতের এই শ্রেষ্ঠ জাতি উলামাদল তথা মুহাদ্দিসীনের শ্রমকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বর্ণিত অগণিত হাদীসের মধ্য

---

[75] সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত।

[76] সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দিমাহ, যা কিছু শুনবে তার সব বর্ণনা থেকে নিষেধাজ্ঞা অনুচ্ছেদ, ১/৮।

হতে প্রকৃত হাদীসটি খোঁজে বের করতে তাদেরকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। হাদীস মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা বা প্রজ্ঞা হিসেবে কুরআনের মতই তার হেফাযত করতে আল্লাহ তা'আলা এ ধরণের আলেমের এক ঝাঁক তৈরী করে দেন। যারা তাদের জীবনের সিংহভাগই হাদীস চর্চার পিছনে ব্যয় করে রাসূলের প্রকৃত বাণীটি উম্মতের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হন। আর একেই আমরা সহীহ হাদীস বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে জানি।

উলামায়ে উম্মতের এই শ্রেণির অন্যতম ছিলেন ইমাম বুখারী রাহ.। আরব রীতি অনুযায়ী বংশধারা সহ তার পুরো নাম হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন বারদিযবাহ। তার মূল নাম মুহাম্মদ। তিনি ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার (৮১০ খ্রিস্টাব্দ) খোরাসানের বুখারা এলাকায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অংশ) জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ৯ বৎসর বয়সে কুরআন মুখস্থ শেষ করেই ১০ বৎসর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ, হাদীসের চর্চা, হাদীস সংরক্ষণ করতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। তার মেধা ছিল বর্ণনাতীত। তার মেধা, হাদীস গ্রহণে সতর্কতার বিভিন্ন ঘটনা কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম 'সহীহুল বুখারী' নামে প্রসিদ্ধ হাদীসের এই গ্রন্থটির রচনা বলে উল্লেখ করেছেন উলামায়ে

কেরাম। হাদীসের উপর পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর ২১৭ হিজরী সনে তার বয়স যখন ২৩, তখন তিনি এই গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি দীর্ঘ ষোল বছর সাধনার মধ্য দিয়ে ২৩৩ হিজরী সনে এর কাজ সমাপ্ত করেন। রচনাকালে তিনি সর্বদা সওম পালন করতেন এবং প্রতিটি হাদীস লিখতে গোসল করে দু রাক‘আত সালাত আদায় করতেন বলে জানা যায়। বিশুদ্ধতার উপর নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো হাদীস লিখতেন না। বর্ণনায় আরো জানা যায় যে, তিনি বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হাদীসের সংকলনের ইচ্ছায় তার মুখস্থ অনুমানিক ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে একেবারে সহীহ বা বিশুদ্ধ হাদীসটিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেন। এত সংখ্যক হাদীস থেকে বিভিন্ন হাদীস বারবার বর্ণনা সহকারে মাত্র ৭২৭৫ বা তার সামান্য কমবেশ[77] হাদীস তার কিতাবে স্থান পেয়েছে। সহীহুল বুখারী হিসেবে কিতাবটির নাম সর্বজনের কাছে পরিচিত। তবে তার মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামি‘উস্-সহীহ’। ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল,

---

[77] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১০ নং অনুচ্ছেদ জামে‘ এর হাদীসের সংখ্যা, ১/৪৬৫।

মোতাবেক ৩১ আগষ্ট ৮৭০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব মারা যান।[78]

উলামায়ে উম্মতের মূলধারার আলেম তথা আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদেরকে সর্বদা সহীহ হাদীসকেই গ্রহণ করতে এবং অন্যান্য ভেজালযুক্ত হাদীসকে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করতে দেখা গেছে। জানা অবস্থায় কেউই সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সহীহ হাদীস ছাড়া শরীয়তের বিষয়াদি প্রমাণ করতেন না। ইমাম বুখারী তাঁর এই রচনায় সহীহ গ্রহণের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফল হয়েছেন বলে সমস্ত উলামায়ে মুহাদ্দিসীন যাচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার চেষ্টায় সফল হওয়ায় সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে তাঁর কিতাবের সুনাম, সুখ্যাতি ও মূল্যায়ন ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কিতাব দল মত নির্বিশেষে সর্বজনের কাছে 'আসাহ্হুল কুতুব বা'দা কিতাবিল্লাহ' বা কুরআনের পর সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে ভূষিত হয়। এর মত আরেকটি কিতাব 'সহীহ মুসলিম' ছাড়া অন্য সব কিতাবের হাদীস যাচাই করে নেওয়াকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম জরুরী মনে করলেও তাঁর এ কিতাবের হাদীসগুলো নির্বিচারে গ্রহণের অনুমোদন দেন।

---

[78] বিস্তারিত দেখুন, শায়খ আব্দুল্লাহ মুহসিন, আল ইমাম বুখারী ও কিতাবুহু আল-জামি'উস সহীহ।

এই হলো ‘সহীহুল বুখারী’ বা আমাদের মাঝে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিত কিতাবের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারকথা। অত্যন্ত সংক্ষেপে আমরা যে সার কথাটি জানলাম তা হলো,

*‘সহীহুল বুখারী’ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারীর লিখিত একটি হাদীসের কিতাব।

* এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপুল সংখ্যক বিশুদ্ধ হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

* তাঁর কিতাবের সমস্ত হাদীস বিশুদ্ধ বলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

* যাচাই বা নিরীক্ষা ছাড়াও আমরা তাঁর কিতাবের হাদীস গ্রহণ করতে পারি।

তাঁর কিতাবের হাদীসগুলো সহীহ জানার পর এখন আমাদের করণীয় কী? এই প্রশ্নের উত্তর আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের কাছে একটিই। আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা মোতাবেক আমাদের করণীয়:

* হাদীসগুলো থেকে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

* বেশি বেশি এই হাদীসগুলোর চর্চা করতে হবে।

* হাদীসগুলো নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

* হাদীসগুলো মুখস্থ করা, বর্ণনা করা, তার প্রচার প্রসার করতে হবে। হাদীসের ক্ষেত্রে এই হলো রাসূলের শিক্ষা। সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকেও আমরা এই শিক্ষাই দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীকৃত খাইরুল কুরুনেও এই ছিল হাদীসের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ।

এর বিপরীত ঈসালে ছওয়াবের জন্য হাদীস তেলাওয়াত করা, অসুস্থ হলে বা যে কোনো বিপদে মুসিবতে পড়লে হাদীস পাঠ করে দো'আ করার কোনো নজীর না রাসূলের শিক্ষায় রয়েছে, না সাহাবিদের জীবনে রয়েছে, না খাইরুল কুরুনে রয়েছে। কিন্তু কে বা কারা কুরআনের মত বিভিন্ন বাহানায় এই কিতাবের হাদীসকে তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য 'খতমে বুখারী' নামে এই প্রসিদ্ধ 'সহীহুল বুখারী' কিতাবের খতম বের করেছে তার কোনো হদীস না থাকলেও আমাদের মাঝে তা অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। এই কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো'আ করলে নাকি দো'আ

কবুল হয়। রাসূলের বাণী ছাড়া এমন কথা বলার সাহস আমরা কী-ভাবে পাই তাতে অবাক লাগে। এর নাম আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ নয় কি? আমাদের বাস্তব জীবনে এই কিতাবের হাদীসের তেমন একটা গুরুত্ব না দেখা গেলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষার উল্টো বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ এবং এই বিপরীতমুখি শিক্ষার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দেখা যায়। পেটপূজারী বা আলেম নামে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি হয়তো এর সূচনা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে খাইরুল কুরুনের বিপরীত কর্ম কী-ভাবে বর্তমান আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাত দাবীদার আলেমদের মাঝে প্রচলন লাভ করে তা ভেবে পাওয়া মুশকিল। অর্থের লোভ ছাড়া বাহ্যত আর কোনো কারণ না দেখে গেলেও এতসব আলেমকে এদিকে সম্পৃক্ত করাটাও দুস্কর। আল্লাহই ভাল জানেন।

কথিত রয়েছে, ইমাম বুখারী রাহ. না কি এই কিতাব শেষ করে দো‘আ করেছিলেন। এই বাহানায় এই কিতাবের খতমের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

পাঠক, এই কথাকে আপনি নিজের বিবেক খাটিয়ে একটু চিন্তা করে বুঝুন। ইমাম বুখারী রাহ. এত বছরের সাধনায় যে কর্ম করেছেন তা তাঁর একটি নেক আমল। কুরআন ও হাদীসের ভাষায় যা ‘আমলে সালেহ’। তাঁর কর্মটি যে ‘আমলে সালেহ’ এতে কোনো

সন্দেহ নেই। হাদীসের মাধ্যমে আমরা তা প্রমাণ করেছি। ‘আমলে সালেহ’ বা নেক কর্মের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আমলে সালেহের পর দো‘আ কবুল হয় বলে হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। তাই বুখারী রাহ. এর জন্য এটা করা স্বাভাবিক। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, ‘আমল’ কোনটি সালেহ আর কোনটি সালেহ নয় তা সম্পূর্ণ তাওক্বীফী বা নুসূস নির্ভর বিষয়। ওহির বাইরে যুক্তি দিয়ে এ বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই। ইমাম বুখারী রাহ. এর কর্মটি আমলে সালেহ হওয়ার বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী রয়েছে। কিন্তু আমাদের এই কর্ম কি তাই? তার কর্ম আর আমার কর্ম কি এক? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এমনটি করতে বলেছেন? সাহাবিরা কখনো এমনটি করেছেন? এসবের উত্তর যদি ‘না’ হয় তবে কোন বাহানায় আমরা এ ধরণের কর্মের বৈধতা দেই? না কি উপার্জনের স্বার্থে হালালকে হারাম করার মত পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি?

এই খতমের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য আরো বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম বুখারী রাহ. নাকি এই কিতাবের কাজ সমাপ্তির পরে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর এই কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দো‘আ করবে আল্লাহ যেন

তাঁর দো‘আ কবুল করেন। এ থেকেই নাকি এই খতমের সুত্রপাত। পাঠক, এই কথাটি আপনি কী হিসেবে দেখেন? বুখারী রাহ. এর কিতাব রচনার প্রেক্ষাপটের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে আপনি এমন কোনো কথা পাবেন না। ‘সহীহুল বুখারী’ রচনার কয়েক শতাব্দী পর পর্যন্ত ইমাম বুখারী রচিত এ গ্রন্থের চর্চা, তার খেদমত অত্যন্ত ব্যাপক হারে হলেও খতমের নজীর দেখবেন না। এ থেকেই এসব কিছু যে বানানো গল্প তা অতি সহজে অনুমেয়। তা ছাড়া বুখারী রাহ. এর মত বিশুদ্ধ আকীদার ধারক ব্যক্তির দিকে এমন কথার অপবাদ দেওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেকের কাছে প্রশ্ন। ইমাম বুখারী রাহ. তিনি কি শারি‘ তথা শরীয়ত প্রবর্তক? তিনি এমন কথা বললে তা অনুসরণযোগ্য হবে? নাকি তার আক্বীদা প্রশ্নবিদ্ধ হবে? যাই হোক আমরা অযথা অনির্ভরযোগ্য কোনো কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যক্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না। আমরা এই কথাগুলোকেই অসার বলে ধরে নেই। বুখারী পড়ে দো‘আ কবুল হলে রাসূলের অন্য সব হাদীসের কি দোষ? নাকি আপনার অভিজ্ঞতায় অন্য হাদীস পড়ে দো‘আ করলে তা কবুল হয় না, শুধু এই কিতাবের হাদীস পড়লে দো‘আ কবুল হয়? সাহাবিরা যে সব হাদীস জানতেন তা তাদের কাছে হাদীস বলে সন্দেহ ছিল নাকি? নাকি তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন? নাকি তাদের কারো

জীবনে কোনদিন কোনো বিপদ মুসিবত আসে নি? তারা একটি দিনও একটি হাদীস পড়ে দো‘আ করলেন না তার কারণ কি?

মোটকথা, অভিজ্ঞতার নামে রাসূলের শিক্ষার বাইরে আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই।

পাঠক, আশা করি আমরা এই বুখারী খতমের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। এতো হলো শুধুমাত্র মূল খতমের বিষয়। অর্থাৎ এটি একটি রাসূলের শিক্ষা বিরোধী কর্ম। যার কোনো নজীর বা দৃষ্টান্ত সোনালী যুগে নেই। অপরদিকে খতমে কুরআনের বেলায় তা খেলাফে সুন্নাহ হওয়া ছাড়া আরো যে সমস্ত অতিরিক্ত খারাবী উল্লেখ করা হয়েছিল তার অনেকটা এই খতমে বুখারীতেও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তা খতমে কুরআনের তুলনায় অধিক। যেমন:

* কুরআন খতম করা বুখারী খতমের তুলনায় অনেক সহজ। তাই কুরআন সাধারণত খতম তথা পড়ে শেষ করা হয়। খতম না করে মিথ্যা বলার ধোকা কুরআনের বেলায় কম হয়। পক্ষান্তরে বুখারী পুরো পড়া অনেক কঠিন। তাই এখানে খতমের আয়োজকের জিজ্ঞাসার উত্তরে খতম হয়ে গেছে বলে মিথ্যার ধোকা প্রায়ই অপরিহার্য বলে দেখা যায়।

* কুরআন সাধারণত আলেম বলতেই সবাই পড়তে পারে। তাই তাজবীদ, সিফাত, হক্ক আদায় করে তেলাওয়াত বা অতি দ্রুত তেলাওয়াতের ক্রুটি ছাড়া সাধারণত শব্দ ভুলের ক্রুটি হয় না। পক্ষান্তরে বিজ্ঞ আলেম ছাড়া অনেকেই হাদীস পড়তে পারে না। টাকার স্বার্থে খতমে অংশ নিয়ে সে আল্লাহর রাসূলের বাণীকে তার মনমত ভুল উচ্চারণ করে। এমন ভুলকেও মুহাদ্দিসীনে কেরাম রাসূলের উপর মিথ্যা বলার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

* ইতোপূর্বে বলেছি যে, বুখারী অধিকাংশ সময়ই খতম হয় না। একজনের অংশ শেষ হলেও আরেকজন তার নির্ধারিত অংশ শেষ করতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের সাথে মিথ্যা বলা ধোকা দেওয়ার সাথে সাথে দো'আর সময় আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলতে অনেক দিন লক্ষ্য করা গেছে। যেমন. দো'আয় বলা হয়, "আল্লাহ, এই আমাদের বুখারী খতমকে..." " যে খতম করা হয়েছে..." ইত্যাদি।

* হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়া অবস্থায় অনর্থক গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, ঢং তামাশা থেকে সাধারণত কোনো মজলিসই খালি থাকে না। একমাত্র খতমের আয়োজক সামনে থাকলে তাঁর ভয় বা সম্মানে নিশ্চুপ পড়া হয়। হাদীসের সাথে বেয়াদবী ছাড়া এ সবের নাম কি দেওয়া যায়?

* এই খতমে মাঝে মধ্যে সবচেয়ে বড় আপত্তিকর যে বিষয়টি সংঘটিত হয় তা হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম জপের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ যা সম্পূর্ণরূপে শির্ক। কেননা বরকতের জন্য কারো নাম জপ করা তাঁর ইবাদত বা আর্চনার শামিল। বরকতের জন্য একমাত্র আল্লাহর নামই নেওয়া যায়। তাই বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিলেও শির্কের গোনাহ্ কাঁধে বহন করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানের শেষদিকে আসহাবে বদরিয়্যিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ সম্বলিত হাদীসটি সবাইকে শুনিয়ে পূনরায় পড়া হয়। তাদের নাম নেওয়ার কারণ হিসেবে বরকতের কথা উল্লেখ করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের নামের দোহাই দিয়ে দো‘আ করা হয়। কারো দোহাই দিয়ে দো‘আর ব্যাপারটি খতমে তাসমিয়াতে আমরা আরেকটু বিস্তারিত জানব ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, বরকতের জন্য আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নেওয়া শির্ক।

সত্য সন্ধানী নিঃস্বার্থ ব্যক্তির জন্য এই খতমের তাৎপর্য বুঝতে আর কোনো বেগ পেতে হবে না বলে আশা করি। আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে অসংখ্য এসব মজলিসে শরীক হওয়ার কারণে যে সব গুনাহ সংঘটিত হয়েছে তা থেকে ক্ষমা করুন এবং আমি সহ

সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। স্বার্থের জন্য দীনকে জলাঞ্জলি দেওয়া থেকে আমাকে এবং সবাইকে বিরত রাখুন। আমীন।

খতমে না-রী

‘খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারীয়াহ’। মানুষের বানানো দুরুদের নামে নির্দিষ্ট কিছু বাক্য। এই বাক্যগুলো ৪৪৪৪ বার পড়লে এই খতম হয়। কথিত আছে এই খতম পড়লে নাকি আগুন যেমন কোনো বস্তুকে ভস্মীভূত করে দেয় ঠিক তদ্রূপ এই খতমও বিপদ আপদকে ভস্মীভূত করে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই এই খতমের নাম আরবী শব্দ “نَار” যার অর্থ আগুন, এই অর্থের দিকে সম্পৃক্ত করে এর নাম ‘খতমে নারী’ বা ‘দুরুদে নারী’ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই খতমের উৎপত্তি কোথা থেকে? এর প্রথম আবিষ্কারক কে? এতে যে দো‘আ পড়া হয় তার মর্ম কী? অনেকে একে দুরুদে নারী নাম দেন, একে দুরূদ নামে নামকরণ করা অদৌ বৈধ কি না? তা জানা না থাকলেও কারো কারো কথায় আমরা এমন কাজের পিছে দৌড়াই। এতে যেমন কান্না পায় আবার হাসিও পায়। অথচ দুনিয়ার সাধারণ একটি বিষয় হলেও আমরা অনেক যাচাই বাছাই করে অগ্রসর হই। ডাক্তারের কথা শুনলেই দৌড়াই না, বরং পূর্বে তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করি। অথচ ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে একটি আমল করছি বা করাচ্ছি আর একবারও ভেবে দেখছি না। এসব হচ্ছে ঈমান আক্বীদার বিষয়ে আমাদের শৈথিল্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ। প্রশ্ন হলো, যিনি আমাকে এই খতম পড়ানোর জন্য উৎসাহিত

করলেন তিনি তার কতটি রোগ বালাই এই দুরূদ দ্বারা সমাধান করেছেন? নাকি হাসপাতাল আর ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন? এই দুরুদের এত অ্যাকশন হলে তিনি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিপদে জর্জরিত হয়ে তা দূর করার জন্য অন্য পথ খোঁজেন কেন? জানা দো'আটি পড়ে ফেললেই তো হয়। আফসোস, যার নিজের আস্থা এই দুরূদের উপর নেই, থাকার কথাও নয়, তিনি কীভাবে মানুষকে এটি পড়ানোর উপদেশ দেন? অপরদিকে আমাদের পাগলামী দেখে আফসোস হয় যে, আমরা কী-ভাবে এমন কথা গ্রহণ করি? ঔষধ মনে করলেও খাবে একজন আর ভাল হবে আরেকজন? এইটুকু বোঝার কি বিবেক আমাদের নেই?

যাই হোক এবার আমরা মূল বিষয়ে আসি এবং জানার চেষ্টা করি খতমে না-রী কী? এবং তা পড়া বা পড়ানো কতটুকু সমীচীন?

প্রথমেই মানুষের বানানো দো'আটি ও তার অর্থ উল্লেখ করছি। সত্যসন্ধানী ব্যক্তি অর্থের দিকে একটু মনোনিবেশ করলেই দো'আটির তাৎপর্য এবং এমন দো'আ পড়া কতটুকু সিদ্ধ তা বুঝে নিতে পারবেন। দুরুদের নামে আরবী যে বাক্যগুলো পড়া হয় তা নিম্নরূপ:

"اللّٰهُمَّ صَلِّ صَلاةً كامِلَةً وسَلِّمْ سَلامًا تامًّا على سَيِّدنا محمدٍ الذي تَنْحَلُّ به العُقَدُ، وتَنْفَرِجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسْنُ الخواتِمِ ويُسْتسقى الغمامُ بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعددِ كل معلوم لك".

"হে আল্লাহ পরিপূর্ণ রহমত ও পূর্ণ শান্তি বর্ষিত কর আমাদের সরদার মুহাম্মদের উপর যার মাধ্যমে সমস্যাসমূহ সমাধান হয়, দুঃখ দুর্দশা তিরোহিত হয়, প্রয়োজনাদি মিটিয়ে দেওয়া হয়, পূণ্যাবলী ও সুন্দর শেষ পরিণাম অর্জিত হয়, তার পবিত্র চেহারা/সত্তার মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করা হয়। আর রহমত বর্ষণ কর তার পরিবার ও তার সাহাবায়ে কেরামের উপর তোমার জানা সংখ্যানূযায়ী, প্রতিটি মুহুর্তে ও নিঃশ্বাসে "

সচেতন ও সত্যসন্ধানী আলেমকে এ দুরুদের সমস্যা ব্যাখ্যা করে বুঝাবার প্রয়োজন নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্র দুরূদটির শব্দ বা অর্থের প্রতি একটু খেয়াল দিলেই এর সমস্যা বুঝতে পারবেন। খতমটিতে যেহেতু অনেক আপত্তিকর শব্দ বা বাক্য রয়েছে তাই এর আপত্তিগুলো কোনো পর্যায়ের নিজ বিবেক দিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। সবাই সহজে বোঝার জন্য প্রথমে

প্রাসাঙ্গিক কিছু কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে করে এর তাৎপর্য বুঝা আমাদের জন্য সহজ হয়।

আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষ বলতেই একথা বিশ্বাস করেন যে, সবকিছুর মূল সমাধানকারী বা পরিচালনাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহতে বিশ্বাসী মুসলিম অমুসলিম সকলেই এ বিশ্বাস পোষণ করেন। তবে মুসলিম ব্যক্তির বিশ্বাস আর আস্তিক বিধর্মীর বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, মুসলিম মনে করেন আল্লাহ কোনো কিছুর সমাধান বা পরিচালনা করতে কারো মুখাপেক্ষী নন। তার কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তিকে মিডিয়া বানাবার দরকার পড়ে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমের বিশ্বাস হলো, বাদশা যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী থাকেন আল্লাহও এরকম মুখাপেক্ষী। বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ যেমন সরাসরি বাদশাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে পারে না, মিডিয়ার প্রয়োজন হয়, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহও সবাইকে চিনেন না, তাঁর কাছে সরাসরি পৌছা যায় না, তাই তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে বিশেষ ব্যক্তিকে মিডিয়া বানানো প্রয়োজন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাদের এসব বিশ্বাস বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো থেকে তাদের এমন বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মক্কার সমস্ত কাফের এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করত। মূল পরিচালনায় তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে কুরআনের

একাধিক আয়াতে এর প্রমাণ মিলে। মূর্তির পূজা করলেও মূর্তিকে তারা মূল পরিচালনাকারী বলে বিশ্বাস করত না। তাদের নিজের মুখের কথা ছিল,

(﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر:١٨٨

"আমরা তাদের ইবাদত কেবল এ জন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়"[79]

সবকিছুর ক্ষমতা, রক্ষা, সৃষ্টি, রিযিক, পরিচালনা ইত্যাদির মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। কুরআনে অসংখ্য জায়গায় এর আলোচনা করা হয়েছে। মূল কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে স্বীকার করার পর অন্য কিছুর ইবাদত বা অন্যকিছুকে আল্লাহর অংশীদার করা অযৌক্তিক বলে কুরআনে বারবার দেখানো হয়েছে।

মোটকথা তারা যে সমস্ত মাখলুক বা নেক মানুষের ইবাদত করত ওসিলা হিসেবেই করত। কিন্তু যা ওসিলা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তাকে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ বা বিশ্বাস করাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে শির্কের মাধ্যম বা শির্ক বলেই আখ্যায়িত করেছন। অপরদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের

---

[79] সূরা আয-যুমার:৩

সমস্ত পথকে বন্ধ করেছেন। রাসূলকেও যাতে কেউ কোনো বাহানায় আল্লাহ পর্যন্ত না পৌছায়, আল্লাহর কোনো গুণাবলীতে শরীক না করে, এ ব্যাপারে উম্মতকে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ ...﴾ (الاعراف:١٨٨)

> "হে নবী আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই..."[80]

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ... ﴾ (يونس:١٠٧)

> "আর আল্লাহ যদি আপনার উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন তবে তিনি ছাড়া কেউ তা খণ্ডাবার নেই, পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনাকে কিছু কল্যাণ দান করেন

[80] সূরা আ'রাফ : ১৮৮।

তবে তার মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই...”[81]

এ মর্মের আয়াত কুরআনে অসংখ্য জায়গায় রয়েছে। আমাদের নবী ছাড়া অন্যান্য নবী রাসূলেরও এই শিক্ষাই ছিল বলে কুরআনের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা জানতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। আল্লাহর সাথে শির্ক দুরের কথা, তার প্রশংসায় পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং আপনি চেয়েছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

" أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده". (مسند أحمد، حديث عبد الله بن عباس، رقم:١٨٣٩)

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য করেছ, বরং যা একমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন”[82]

---

[81] সূরা ইউনুস:১০৭।

[82] মুসনাদে আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস, নং: ১৮৩৯।

কোনো কোনো বর্ণনায়,

" ويلك اجعلتني والله عدلا قل ما شاء الله وحده". (سنن النسائي ، باب النهي أن يقال ماشاء الله وشاء فلان)

"তোমার ধ্বংস হউক, তুমি কি আমাকে আল্লাহর সাথে সমতুল্য করেছ? তুমি বল, যা শুধুমাত্র আল্লাহ চেয়েছেন"।[83]

এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: واذكر في الكتاب مريم...رقم:٣٢٦١)

"তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালংঘন করো না, যেমনটি খৃষ্টানরা মারয়ামের পুত্র ঈসার ক্ষেত্রে করেছে,

---

[83] নাসাঈ, সুনান, হাদীস সহীহ, আল্লাহ এবং অমুক চেয়েছেন বলা নিষেধ অনুচ্ছেদ, নং:১০৮২৪।

কেননা আমিতো আল্লাহর বান্দা, তাই তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল”।[84]

এভাবে শির্কের আপনোদন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবার আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও ‘খতমে নারী’ নামক দো‘আটির বাক্যগুলো নিয়ে একটু বিবেচনা করি। আশা করি যিনি প্রকৃত সত্য জানার আগ্রহ রাখেন এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর সাথে সাথে গ্রহণের মানসিকতা রাখেন তার সামনে এই দো‘আর শির্কী শব্দগুলো অতি সহজেই ধরা পড়বে। আর যার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যা করছি আজীবন করেই যাব, আমি টলব তবে আমার বিশ্বাস টলবে না, তার সামনে কুরআনের স্পষ্ট আয়াত পেশ করলেও একটি না একটি অজুহাতে তিনি তার মতকে অটুট ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে বর্ণিত দো‘আটি বা কুরআনের আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অন্যদের ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী ও তাঁর আমল অথবা সাহাবিদের আমল দ্বারা করলেও এখানে এসে নিজের ভ্রান্ত মতকে অটুট রাখতে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আদর্শে আদর্শবান আকাবীর আসলাফদের এই উসূলটি ভুলে যাবেন।

---

[84] সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: কিতাবে মারয়ামের কথা স্মরণ কর..., নং: ৩২৬১।

হানাফী হলেও আবু হানিফা রাহ. এর মানহাজ ভুলে যাবেন। কুরআনের আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপনের কারণে সাধারণ মহিলার কথায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত খলীফার নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আদর্শ ভুলে যাবেন। এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শের চেয়ে নিজ পীর বা নিজের মতের আলেমের কর্মই অগ্রাধিকার পাবে। যেমনটি রাসূল গাইব জানেন বা রাসূল হাজির-নাজির এজাতীয় শির্কী বিশ্বাস পোষণকারীরা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা প্রতিষ্ঠিত রাখার বেলায় করে থাকে। যদিও এ সব বিষয় কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একেই আল্লাহ তা‘আলা প্রবৃত্তি ও আলেমকে প্রভু বানিয়ে তাদের পূজা বলে আখ্যা দিয়েছেন। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে এজাতীয় কর্মকে ‘শিরক ফিল ইবাদত’ বা উপাসনাগত শির্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের আলেমগণ। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (الجاثية:٢٣)

“আপনি কি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার প্রবৃত্তি তথা মনের খেয়াল খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে নিয়েছে। আল্লাহ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কানে ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। আল্লাহ ছাড়া কে তাকে হেদায়াত করবে? তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করো না?”[85]

অন্যত্র এরশাদ করেন,

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًالَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة:٣١)

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের এবং মারয়াম তনয় ঈসাকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে, অথচ তাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছিল শুধুমাত্র এক প্রভুর ইবাদত করতে। একমাত্র তিনি ছাড়া কোনো মা‘বুদ নেই। তারা আল্লাহর যে

---

[85] সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩।

সমস্ত শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি পবিত্র”[86]। এই দুরুদে একমাত্র আল্লাহ করতে পারেন এমন যাবতীয় সিফাত বা গুণাবলীতে রাসূলকে শরীক করা হয়েছে। মাধ্যম হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিডিয়া বা মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর শরীক করা হয়েছে। তাই মাধ্যম হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম উল্লেখ করায় শির্কের মাঝে কোনো তারতম্য সৃষ্টি হবে না। কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস এর প্রমাণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তওফিক দান করুন এবং হেদায়াতের উপর অবিচল রাখুন।

অজুহাত ও তার পর্যালোচনা

একটি দো‘আ বা আরবী বাক্যকে দুরূদ বলতে উচিত ছিল এটা জানা যে, এই দুরূদটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন কি না, জীবনে কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না, অথবা কোনো সাহাবা দুরূদ হিসেবে এই বাক্যগুলো পড়তেন কি না তা দেখা। বিপদে আপদে তারা কোনোদিন এই দো‘আকে আমলে এনেছেন কি না লক্ষ্য করা। কোনো সাহাবা থেকে বিশুদ্ধ সুত্রে এই দুরূদ পেলে আমরা ধারণা করে নিতাম, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু

---

[86] সূরা তাওবা:৩১।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা আমরা বিশ্বাস করি যে, সাহাবায়ে কেরাম ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ থেকে কিছু বলেন না। এর কোনোটি না পেলে এই দো'আ বর্জনের জন্য আমাদের অন্য কিছু দরকার পড়ে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর পড়ার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন দুরূদ ফযিলত সহ বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরূদগুলো কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? মূলত যিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের সকল ক্ষেত্রে রাসূলের শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করেন তার জন্য আর অন্য দুরূদের প্রয়োজন নেই। অন্য দুরূদ জায়েয করতে তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। তার কথা হবে, আমার নবী করেন নি, নবীর হাতেগড়া ছাত্ররা করেন নি, আমি তা করব না। কিন্তু হুবহু সুন্নাতের উপর থাকার আসলাফের সেই জযবা আমাদের থেকে হারিয়ে যাওয়ার কারণে ইবাদতগত বা বিশ্বাসগত নতুন কিছু আসলেও আমাদেরকে জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত হতে হয়। আবু হানিফা রাহ. এর অনুসারী দাবী করলেও হানিফী মানসিকতা হারিয়ে যাওয়ার কারণে নতুন আলোচনার প্রয়াস পায়। বিভিন্ন ওজুহাতে আমরা নব উদ্ভাবিত আমলকে জায়েয করার চেষ্টা করি। খতমে না-রীও এর বিপরীত নয়।

বিভিন্ন সময় এই দো'আটির আপত্তিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলে যে অজুহাতগুলো পেশ করতে দেখা গেছে শুধু সেগুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর তওফিক কাম্য।

প্রথমেই যে অজুহাত পেশ করা হয় তা হলো, আমরা রাসূলকে কেবল মাধ্যম মনে করি মাত্র। এখানে শির্কের কোনো প্রশ্নই আসে না। মাধ্যমে মনে করলেই শির্ক হতে পারে না একথা কতটুকু শুদ্ধ, তা আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে, মাধ্যম মূলতই শির্ক অথবা শির্কের পথ। কেননা কারো সমস্যা সমাধান করতে, দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, প্রয়োজন মিটাতে, বৃষ্টি দিতে আল্লাহ কোনো মিডিয়ার মুখাপেক্ষী নন। এবার আমাদের দো'আটির বিষয়ে আসা যাক। মোটকথা কর্মের যোগসূত্র যার সাথেই রয়েছে সেটিই মাধ্যম, যে কোনোভাবে এই যোগসূত্র থাকুক না কেন। যার সাথে কোনো যোগসূত্র নেই তাকে মাধ্যম বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনি একটি অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কোনো ব্যক্তি আপনাকে তাঁর হাত দ্বারা টান দিয়ে রক্ষা করেছে। আপনি বলতে পারেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। আবার এও বলতে পারেন যে, অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছে। এ দ্বিতীয়

বাক্যটির ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাস হলো, মূলত আল্লাহই আমাকে রক্ষা করেছেন, অমুক ব্যক্তি মাধ্যম মাত্র। এখানে লোকটি বলতে পারে, আল্লাহর দ্বারা রক্ষা পেয়েছি। আবার এও বলতে পারে যে, অমুকের মাধ্যমে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। এখানে তার কোনো কথাই শির্ক হবে না। কিন্তু লোকটি যদি বলে, রাসূল আমাকে রক্ষা করেছেন, অথবা রাসূলের মাধ্যমে আমি রক্ষা পেয়েছি, তবে তার উভয় কথাই শির্ক হবে। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেম এতে সংশয় বা দ্বিমত পোষণ করবেন না। এই একটি বিষয়ে রাসূলের মাধ্যম শির্ক হলে আপনার জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মাধ্যম রাসূলকে বানিয়ে দিলে তা শির্ক হয় না এ কেমন কথা? এবার আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেমগণের কাছে বিনীত আবেদন যে, আপনারা একটু চিন্তা করলেই সমাজ ধীরে ধীরে শির্কমুক্ত হতে থাকবে। তাই চলে আসা প্রথাকে জায়েয বানাবার চেষ্টা না করে সমাজকে শির্কমুক্ত করার দিকে একটু মনোনিবেশ করুন।

জনৈক বিজ্ঞ আলেমের সাথে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি আমাকে বালাগাতের কিতাবে উল্লেখিত উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি শির্ক নয় বলে বুঝাবার চেষ্টা করেন। পরে আরো অনেককে এই উপমা পেশ করতে দেখেছি।

উপমাটি হচ্ছে, "أنبت الربيع البقل" অর্থাৎ বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে। তারা বলে থাকেন, মুমিন ব্যক্তি এই বাক্যটি বললে শির্ক হয় না, কারণ সে এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করে। মুমিনের বিশ্বাস মূল শষ্য দাতা আল্লাহ। বসন্তে তা উৎপাদিত হয়। তাই সে বলে, বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে।

বস্তুত তাদের এ কথাটি অগ্রহণযোগ্য আর এ ধরনের উপমাও আল্লাহর সাথে অসামঞ্জশীল। কারণ কোনো কাজকে কার্যকারনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কিংবা সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোনো হাদীস বা আছার পাওয়া যায় না। বরং এর বিপরীতটিই পাওয়া যায়, দেখুন সাহাবায়ে কিরাম বলেন,

«لولا الكلب لجاءنا اللص»

'যদি কুকুর না থাকত তবে চোর আসত' এ জাতীয় কথাকে শির্কে (আসগর) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই "أنبت الربيع البقل" অর্থাৎ 'বসন্ত শষ্য উৎপাদন করেছে' এটা কোনোভাবেই কোনো মুমিনের কথা হতে পারে না। কারণ মুমিন জেনে বুঝে শির্কে আসগরে লিপ্ত হতে পারে না।

এখন বলতে পারেন তাহলে এ কথাটি কোত্থেকে আসল? বস্তুত তা জানার জন্য আমাদেরকে তথাকথিত বালাগত বিদ্যার প্রবর্তকদের মন-মানষিকতা, আকীদা মাযহাব দেখতে হবে। তাদের অনেকেই মু‘তাযিলা, আশ‘আরিয়্যা ও মাতুরিদিয়া মাযহাবের লোক থাকার কারণে তাদের গ্রন্থে সেটার অনুরনন দেখতে পাওয়া যায়। তারা মাজায বা রূপক বলে অনেক শির্ককে বালাগাত বানালেও সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ জাতীয় কথাকে কখনও স্বীকৃতি দেন না। তাই এ জাতীয় কথা কোনো মুমিন বলতে পারে না।

এ তো গেল বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলার মাসআলা। বাস্তব কার্যকারণের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে কোনো কথা বলা যদি শির্কে আসগার হয়, তবে যেখানে বাস্তব কোনো কার্যকারণ নেই সেখানে সেদিকে সম্পর্কযুক্ত করা নিঃসন্দেহে শির্কে আকবারে পরিণত হবে। যেমন, কেউ যদি বলে “রাসূল শষ্য উৎপাদন করেছেন বা রাসূল ধান দেন” অথবা “রাসূলের মাধ্যমে শষ্য উৎপাদন হয় বা রাসূলের মাধ্যমে ধান হয়” এর কোনটি বলার কোনো সুযোগ নেই, কারণ তা শির্কে আকবার হবে। আশা করি, আশেকে রাসূল নামে রাসূলকে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন গুণাবলীতে সমতুল্যকারী ছাড়া সবাই এ ধরণের কথাটির মারাত্মক পরিণতি

সম্পর্কে জানতে পারলেন। এবার আপনি নিজেই খতমে না-রীর ব্যাপারে ফায়সালা দিন।

এখন উপরোক্ত অজুহাতটির অসারতা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি। তবে এই অজুহাতটি যারা ব্যাকরণ বা ভাষার জ্ঞান রাখেন তারা পেশ করেন। আর যাদের ব্যাকরণের গভীরতা নেই তাদের সামনে এই অভিযোগ তুলে ধরলে তারা প্রথমে অন্য অজুহাত পেশ করেন। সেটি না টিকলে পরবর্তীতে আবার ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলেন। প্রশ্ন হলো, প্রথমে যখন নিজে শির্ক মেনে নিয়ে অন্য অজুহাত দেখালেন তবে সেই অজুহাত না টিকলে আবার পূর্ব কথাকে ব্যখ্যার মাধ্যমে টিকানোর চেষ্টার কী প্রয়োজন।

অন্য অজুহাতের মধ্যে যেমন, একদিন জনৈক আলেমের সাথে আলোচনা করলে তিনি বলেন এখানে, "بِه" শব্দের "ه" সর্বনামটি "صلاة" শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব রাসূলের ওসিলায় নয় বরং এই দুরুদের ওসিলায়। কিন্তু তিনি এটি লক্ষ্য করেন নি যে, " صلاة " শব্দের দিকে সর্বনাম প্রত্যাবর্তিত হলে এখানে পুংলিঙ্গের সর্বনাম "ه" ব্যবহার না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম "ها" হত।

আরেকদিন এ বিষয়ে এক সেমিনারে আলোচনায় এখানে সর্বনাম ‘সালাত’ শব্দের দিকে নেয়ার সুযোগ নেই বললে একজন বলে উঠলেন “صلاة” শব্দটি মাসদার। আর আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী মাসদারের দিকে যে কোনো সর্বনাম ব্যবহার করা যায়, কেননা মাসদার পুংলিঙ্গও নয় আবার স্ত্রীলিঙ্গও নয়। একথা শুনে অত্যন্ত অবাক লাগল। নিজের মতকে অটুট রাখতে কোনদিকে খেয়াল না করে যারা কথা বলেন, তাদের কথায় যেমন হাসি পায় তেমনি তারা এ ধরণের কথা বলে নিজের আস্থা নষ্ট করেন। আরবী ভাষায় উনার জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে প্রশ্ন এসে যায়। কেননা, **প্রথমত:** এখানে “صلاة” স্ত্রীলিঙ্গ ধরেই “كاملة” শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত:** “محمد” শব্দের পরেই “الذي” ইসমে মাউসুল নিয়ে আসা হয়েছে। জানা কথা ইসমে মাউসুলের পরে বাক্য থাকা এবং তার মধ্যে একটি সর্বনাম থাকা জরুরী যা মাউসুলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সুতরাং এখানে “ہ” কে “الذي” এর দিকে না নিয়ে অন্য দিকে নেয়ার কথা বলা কতটুকু গাফলতির পরিচয় একটু ভেবে দেখুন। **তৃতীয়ত:** দো‘আটির শেষদিকে রয়েছে “**بوجهه**” তার চেহারা বা তার স্বত্বার মাধ্যমে। অতএব সর্বনামকে মুহাম্মদ ছাড়া অন্যদিকে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুযোগ থাকাবস্থায় বক্তার কথা থেকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ নেওয়াকে আরবী প্রবচনে বলা হয়,

“توجيه القول بما لا يرضى به القائل” অর্থাৎ বক্তার কথার এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যা বক্তার নিজের উদ্দেশ্য নয়। আর যেখানে কোনো সুযোগ নেই সেখানে এমনটি নেওয়া কতটুকু অবান্তর ও হঠকারিতা একটু ভেবে দেখেছি কি?

এবার ধরে নিন কেউ উপরোক্ত দুরূদটিকে সমান্য পরিবর্তন করে সর্বনামগুলো দুরুদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন একটি দুরূদ বানাল। যার মর্ম হল যেমন, “যে দুরুদের মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান হয় .....”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বা বলে দেওয়া ছাড়া কারো এধরণের কোনো কথা বলে বৈধ কি? বিভিন্ন দুরূদ এবং তাতে কী লাভ, কী ফযিলত, কী উপকার সবই আমাদের নবী আমাদেরকে বলে গেছেন। ওহি ছাড়া এর বাইরে কিছু বলা বৈধ কি? ওহির বিষয়ে ওহি ছাড়া যুক্তি দিয়ে কিছু বলার নামইতো ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। মানুষের জ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে ওহীর সুচনা। ওহীর বিষয়ে যুক্তি দিয়ে বলার কারণেই বিভিন্ন বাতিল দল উপদলের জন্ম। এসব জানা থাকা সত্বেও ওহির মুখাপেক্ষী বিষয়ে আমরা কী-ভাবে দখল দিতে পারি। এটি কি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যাচার নয়?

আরেকটি অজুহাত কেউ কেউ পেশ করেন যে, আমাদের বিশ্বাস তো সবকিছু আল্লাহ করেন। রাসূল করেন বা মাধ্যম হন বলে

আমাদের আক্বীদা নয়। তবে এটি শির্ক কী-ভাবে হয়? আর বেশিরভাগ লোক অর্থ না জেনেই পড়েন। আলহামদুলিল্লাহ, এই বিশ্বাস বলেইতো এই দুরূদ পড়লেই আপনাকে কাফের বা মুশরিক বলা হচ্ছে না। আপনার বিশ্বাস এই দুরুদের মর্মানূযায়ী হলে তো আপনি মুশরিক হয়ে যেতেন। বলা হচ্ছে এখানে শির্কী কথাবার্তা রয়েছে। শিরকী আক্বীদা পোষণ ছাড়া শির্কী কথাবার্তা বলার হুকুম কী প্রশ্নটি আপনাদের কাছে রেখেই ইতি টানছি।

পরিশেষে আরেকটি কথা এই যে, অনেককেই বলতে শুনা যায়, খতমের বিপক্ষে এ সব কথা বলে আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। আফসোস!! আপনি জাতির একজন কর্ণধার। আপনার মুখ থেকে এমন কথা বের হলে ঘুষখোর, সুদখোরের সামনে ঘুষ সুদের বয়ান করলে সে যখন বলে উঠে হুজুর, আমাদের পেটে লাথি মারবেন না। তার কথায় আর আপনার কথায় বেশ কম কী? সবার রিযকের মালিক আল্লাহ। যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য সেই পথকেই সহজ করে দেন বলে আপনার আমার পূর্ণ বিশ্বাস। হালালের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হলে আল্লাহ আপনার আমার রিযকের ব্যবস্থা হালালের মধ্যে থেকেই করবেন বলে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল ইনশা আল্লাহ। এর বিপরীত বিশ্বাসের পরিণাম কী তা আপনার আমার সবারই নিশ্চয় জানা আছে। আল্লাহ আমাদের

সবাইকে বুঝা এবং হালালের উপর থাকার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে ইয়াসিন

কুরআন করীমের মোট ১১৪ টি সূরার একটি সূরার নাম ইয়াসিন। সূরার ধারাবাহিক ক্রমানুসারে এটি কুরআনের ৩৬ নং সূরা। কুরআনের অন্যান্য আয়াত তেলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরে যে পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায় এই সূরা তেলাওয়াত করলেও তার প্রতিটি অক্ষরে সেই পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে কুরআনে মাত্র কয়েকটি সূরা রয়েছে যেগুলোর অতিরিক্ত কিছু ফযিলত রয়েছে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ হাদীসে সূরা ইয়াসিনের অতিরিক্ত কোনো ফযিলত বর্ণিত হয় নি। দু একটি দুর্বল ও বিভিন্ন জাল বানোয়াট হাদীসে এ সূরার বিভিন্ন ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্বল হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিসটি হচ্ছে:

" إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات". (سنن الترمذي، فضل يس، رقم:٢٨٨٧)

"প্রত্যেক বস্তুর একটি হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনে হৃদয় হচ্ছে 'ইয়াসিন'। যে ব্যক্তি 'ইয়াসিন' পড়বে

আল্লাহ তার আমলনামায় দশবার পূর্ণ কুরআন পড়ার নেকী দান করবেন।”[87]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর নিজেই হাদীসটির সনদ গরীব ও দুর্বল বলে মন্তব্য বরং প্রমাণ করেছেন। তার মন্তব্য মতে হাদীসটি একেবারেই দুর্বল। অনেকে হাদীসটিকে বানোয়াট বলেও মন্তব্য করেছেন। তিরমিযির আলোচনা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মোটকথা ‘ইয়াসিন’ সূরার আলাদা ফযিলতে কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস নেই।[88]

হাদীসটির অবস্থা এমন অর্থাৎ বিশুদ্ধ না হলেও তা আমাদের সমাজে অত্যন্ত প্রচলিত। অপরদিকে এই হাদীস এবং আরো কিছু ভিত্তিহীন হাদীসের উপর নির্ভর করে চালু রয়েছে এই সূরার খতম। একবার পড়ার খতম, দশবার পড়ার খতম, চল্লিশবার পড়ার খতম। কুরআন বা সুন্নায় যার কোনো ভিত্তি নেই। যার মনে যা চেয়েছে ইচ্ছামত রাসূলের সুন্নাহ এর পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

---

87 তিরমিযী. সুনান, ইয়াসিনের মর্যাদা অনুচ্ছেদ, নং:২৮৮৭।

88 আলী হাশীশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ, ১/৩৩৫, আলবানী, আস-সিলসিলাতুদ্-দ‘য়ীফাহ, ১/৩১২।

কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তার নিকট এই সূরা খতম করার প্রচলন রয়েছে।

এতে নাকি মুমূর্ষ ব্যক্তির কষ্ট হাল্কা হয়। এসবের কোনো কিছুই সহীহ হাদীস নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালক্বীনের কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ». (صحيح مسلم، باب تلقين الموتى لا اله الا الله، رقم:٢١٦٢)

> “মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে তোমরা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালক্বীন করো।”[89]

এর বিপরীত মূমূর্ষ ব্যক্তির পাশে ‘ইয়াসিন’ পড়ার কোনো আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিক্ষা সাহাবিদের দেন নি। এ সম্পর্কে যা বলা সবই অনির্ভরযোগ্য, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

---

[89] সহীহ মুসলিম, মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর তালক্বীন অনুচ্ছেদ, নং: ২১৬২। তালক্বীন অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি মুখোমুখি এই কালেমা উচ্চরণ করা, যাতে সে তা শিখে বা স্মরণ করে পড়তে পারে। এতে তার জীবনের শেষ বাক্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে।

‘ইয়াসিন’ খতমের একটি বানোয়াট পদ্ধতি

‘নস’ তথা কুরআন হাদীসের শিক্ষা একপাশে রেখে যুক্তি ও মনগড়া এবং সহীহ ছেড়ে ভিত্তিহিনের উপর দিয়ে নিজের মর্জি মোতাবেক শরী‘আত পরিবর্তনের কর্ম মূলত শিয়া, খাওয়ারিজ ইত্যাদি ভ্রান্ত সম্প্রদায় থেকেই শুরু হয়। পরবর্তীতে তাদের প্রভাব অনেক আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আলেমদের মাঝে বিস্তার লাভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় একটু গভীর দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ধরা পড়বে বলে আশা করি। এবার শিয়াদের বানানো একটি মনগড়া ‘খতমে ইয়াসিন’ দেখুন,

প্রয়োজন পূরণে ইয়াসিনের খতম যার পদ্ধতি এই[90]

بِسْمِ اللّٰه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

﴿ يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ

---

[90] মুনতাদাল-কফীল ওয়েব। আল-মুনতাদার্-রাসমি, শায়খ আব্দুর রেযা মা‘আশ।

لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾

এরপর এই দো'আ তিনবার পড়বে:

سُبحَان ٱلْمُفَرِّج عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان ٱلْمخَلِّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان ٱلْمُنَفِّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان ٱلعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ ٱلكَافِ وَٱلنُّونِ , سُبحَان مَن إِذَا أَرادَ شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان ٱلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُون .

এরপর বল:

ٱللّهُمّ ٱفتَحْ لي أَبوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَبوَابَ خَزَائِنِكَ بِحَقِّ سُورَة يس وَبِفَضْلِكَ وَكَرمِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرّاحِمِينَ

এরপর তুমি ১০০ বার বল

إِلهِي بِحَقِّ سِرِّ هَذِهِ ٱلأَسْرَارِ وَ بِحَقِّ كَرَمِكَ الخَفِيِّ وَبِحَقِّ اِسْمِكَ ٱلعَظيمِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَاتِنَا يَاقَاضِيَ الحاجاتِ يَا أَرحَمَ ٱلرّاحِمِينَ

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِين﴾.

এরপর একবার পড়বে

سُبحَان ٱلْمُفَرّج عَن كُلِّ محزُونٍ ، سُبحَان ٱلْمخَلّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان ٱلْمُنَفّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان ٱلعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن إذَا أَرادَ , سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ ٱلكَافِ وَٱلنُّونِ شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان ٱلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُون

এরপর ১০০ বার বল (يا مفرج الهم).

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا

الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾

এরপর পড়বে

سُبحَان اْلمُفَرّجِ عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان اْلمخَلّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان اْلمُنَفّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان اْلعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن إذَا أَرادَ , سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ اْلكَافِ وَاْلنُّونِ شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان اْلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُون .

এরপর বল

اللّٰهُمَّ افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.

এরপর ১০০ বার বল (يامفرج الهم)

এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي

الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ

الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

এরপর পড়বে:

سُبحَان الْمُفَرِّجِ عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان الْمخَلِّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان الْمُنَفِّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان الْعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ الْكَافِ وَالْنُونِ , سُبحَان مَن إذَا أَرادَ شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان الّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرجَعُون

এরপর বল

اللّٰهُمَّ افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বার বল

يامفرج الهم

এবং এই দো‘আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

এরপর পড়বে

سُبحَان ٱلْمُفَرِّج عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان ٱلْمخَلِّص عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان ٱلْمُنَفِّس عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان ٱلعالِم عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ ٱلكَافِ وَٱلنُّونِ , سُبحَان مَن إذَا أَرادَ

شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان ٱلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَإلَيْهِ تُرجَعُون

এরপর বল

اللّٰهُمَّ افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين

এরপর ১০০ বল:(يامفرج الهم)এবং এই দো'আ কর

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴾

এরপর পড়বে

سُبحَان ٱلْمُفَرِّج عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان ٱلْمخَلِّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ
، سُبحَان ٱلْمُنَفِّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان ٱلْعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ،
سُبحَان مَن إذَا أَرادَ , سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ ٱلْكَافِ وَٱلْنُّونِ
شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان ٱلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ
وَإلَيْهِ تُرجَعُون .

এরপর বল

اللّٰهُمَّ افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس
وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.

এরপর ১০০ বার বল (يامفرج الهم) এবং এই দো'আ কর:

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك
العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي
الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا
يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾

এরপর পড়বে

سُبحَان ٱلْمُفَرِّجِ عَن كُلِّ مَحزُونٍ ، سُبحَان ٱلْمَخَلِّصِ عَن كُلِّ مَشحُونٍ ، سُبحَان ٱلْمُنَفِّسِ عَن كُلِّ مَديُونٍ سُبحَان ٱلعالِمِ عن كل مَكنُونٍ ، سُبحَان مَن إذَا أَرادَ , سُبحَان مَن جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَينَ ٱلكَافِ وَٱلنُّونِ شَيْئاً أن يَقولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُبحَان ٱلّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلَيْهِ تُرجَعُون .

এরপর বল

اللّٰهُمَّ افتح لي ابواب رحمتك وابواب خزائنك بحق سورة يس وبفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين.

এরপর ১০০ বল (يامفرج الهم) এবং এই দো'আ পড়:

الهي بحق سر هذه الاسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم ان تقضي حاجاتنا (وحاجات الحاضرين) ياقاضي الحاجات يا ارحم الراحمين.

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

পাঠক, পদ্ধতিটি নমুনা স্বরূপ হুবহু উল্লেখ করতে গিয়ে একটু দীর্ঘ হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে শিয়া আলেমদের উল্লেখিত পদ্ধতিটি হুবহু তুলে ধরলাম। পদ্ধতিটির সাথে বানোয়াট অনেক ফযিলত উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে যাবে বলে তা ছেড়ে দেয়েছি। নিশ্চয় আপনি ইয়াসিন খতমের এই পদ্ধতি দেখেই তা মনগড়া বানোয়াট এবং বানানো বলে উড়িয়ে দিবেন। কারণ হিসেবে রাসূল শিখান নি, সাহাবিরা করেন নি, খাইরুল ক্বুরুনে এর কোনো নজীর নেই বলে উল্লেখ করবেন। এই যদি হয় এই পদ্ধতি বানোয়াট হওয়ার দলীল এবং বাস্তবেও তাই, তবে আমাদের মাঝে যে পদ্ধতির প্রচলন আছে তার কি কোনো অস্তিত্ব কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত যুগে আছে? যদি এর উত্তর ‘না’ হয় এবং আসলেও তাই, তবে উভর পদ্ধতিই মনগড়া ও বানোয়াট। সবকিছু থেকেই বিরত থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য। আর যদি বলেন, বুযুর্গদের থেকে এমন আমল পাওয়া গেছে, তবে অন্যদের বুযুর্গদের কি দোষ? আপনার আমার বুযুর্গের কথা গ্রহণযোগ্য, আর তাদের বুযুর্গদের কথা গ্রহণযোগ্য নয় এ কেমন ইনসাফ? আপনি নিজেই বিচার করুন।

নিজের পক্ষের লোকের কথা নির্বিচারে গ্রহণ, অন্যের কথা শুদ্ধ হলেও প্রত্যাখ্যান এটি একমাত্র বিভ্রান্ত দলের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে আহলুস্সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের বৈশিষ্ট হচ্ছে,

সবার কথা নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ, সহীহ বা নির্ভুল হলে অন্যের কথাও গ্রহণ। ভুল হলে নিজ মতাদর্শের লোকের কথাও প্রত্যাখ্যান। এই আমানতদারীর সাথে তারা দ্বীনি ইলমের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যুক্তির আলোকে সুন্নাহ বিরোধী কর্ম সৃষ্টির সূচনা করতে পারলে আরেকজন তার যুক্তিতে বানানো জিনিসটিকে একটু মোডিফাই বা সুন্দর করতে সমস্যা কোথায়? বরং এটাইতো নিয়ম। যাইহোক, আমরা যারা সুন্নাতের উপর থাকতে চাই, সুন্নাতকে যুক্তি ও প্রচলনের উপর অগ্রাধিকার দেই ইবাদতের মধ্যে কম বেশ নতুন কোনো নিয়মই আমরা মানি না বা মানতে পারি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বাইরে গেলেই বিদ‘আতে লিপ্ত হওয়ার আশংকা সর্বদা আমাদের মনে কাজ করে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই আদর্শের অবিচল রাখেন। সবাইকে সুন্নাহ বোঝার তওফিক দান করেন। হুবহু সুন্নাতের উপর থাকা, বিদ‘আতকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার তওফিকই তার কাছে আমাদের কাম্য। আমীন।

খতমে শিফা

'শিফা' শব্দের আরবী মূল শব্দ 'شِفاء' যার অর্থ রোগমুক্ত করা বা রোগ নিরাময়। এভাবে 'খতমে শিফা' অর্থ: রোগ নিরাময় করার খতম। কেউ অসুস্থ হলে তার রোগমুক্তির আশায় এই খতম পড়ানো হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত একটি বইয়ে এই খতমটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

> **"খতমে শিফা**
>
> لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)
>
> এই পবিত্র কালেমা একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে "খতমে শিফা" বলে। একে খতমে তাহলীলও বলা হয়। এই খতম পাঠ করিয়া এর সোয়াব মৃত লোকের রূহের উদ্দেশ্যে বখশিশ করিয়া দিলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এর উসিলায় তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন ও বেহেশত দান করবেন। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা কোনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘদিন ভুগিতে থাকে, তবে উক্ত কালাম তাহার নিকট বসিয়া সশব্দে পাঠ করিতে থাকিবে, যেন সেই রোগী উহা শুনিতে পায়।

> আল্লাহর ফযলে খতম শেষ হইবার পূর্বেই ইহার আশ্চর্য ফল বুঝিতে পারা যায়। কোনো মুমূর্ষু লোকের নিকট বসে এই খতম পাঠ করলে তাহার রোগ যন্ত্রনা লাঘব হয় এবং পরমায়ূ শেষ হইয়া থাকিলে আছানির সহিত মৃত্যু হয়। এই খতম একজনে পাঠ করাই ভাল, তবে জরুরী প্রয়োজনে ১০/১৫ জন একত্র বসিয়া একদিনেও খতম করা চলে।"[91]

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'ঊন। ওহি নির্ভর কথার উপর নিজ থেকে কিছু বলার কি দুঃসাহসিকতা!!

রোগ আল্লাহ দেন এবং তিনিই মানুষকে রোগমুক্ত করেন। কারো রোগ দেখা দিলে রোগীর নিজের কী করণীয় এবং তার বেলায় অন্যদের কী করণীয় সবই বলে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাঝে 'খতমে শিফা' নামের কিছু নেই।

---

[91] মোকছুদুল মো'মিনীন বা বেহেশ্তের পুঞ্জী, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খ-, ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি চিকিৎসা করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

« تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم ». (سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الرجل يتداوى، رقم: ٣٨٥٧، سنن الترمذي، كتاب الطب، باب الدواء والحث عليه،رقم:٢٠٣٨)

‘‘তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। কেননা মহান আল্লাহ তা‘আলা এমন কোনো রোগ দেননি যার ঔষধ দেননি, একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত।’’[92]

আরেকটি হাদীসে এরশাদ করেন:

« لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل »

(صحيح مسلم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، رقم:٥٨٧١)

---

[92] আবু দাঊদ, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণ অনুচ্ছেদ, নং: ৩৮৫৭, তিরমিযী, সুনান, চিকিৎসা অধ্যায়, ঔষধ ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অনুচ্ছেদ, নং: ২০৩৮।

“প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে। অতঃপর যখন ঔষধ রোগের সাথে ঠিকমত পড়ে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হয়।”[93]

এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসা গ্রহণের আরো অনেক হাদীস রয়েছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। হাদীসের পাতা খুললেই চিকিৎসা গ্রহণের ঘটনা পাওয়া যায়। মুহাদ্দিসীনে কেরামের অনেকে তাদের কিতাবে ‘চিকিৎসা অধ্যায়’ নামে পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তবে মুমিন ব্যক্তি চিকিৎসাকে শুধুমাত্র মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন। তার বিশ্বাস, রোগ নিবারণের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তবে আল্লাহ অমুক ঔষধ অমুক রোগের জন্য দিয়েছেন বলে গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ের পণ্ডিতগণ জানতে পেরেছেন। তাই ঔষধ ব্যবহার মূলত আল্লাহর নির্দেশ বলেই আমরা হাদীসের আলোকে জানতে পারি। বিধায় মুমিন ঔষধ ব্যবহার করেন। এতে তিনি নবীর সুন্নাত পালন করেন। তাই মুমিন ঔষধ ব্যবহার করলেও আল্লাহকে ভুলেন না। ঔষধ যেন ঠিকমত কাজ করে তার জন্য তিনি সকাতরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। ঔষধ তাকে আল্লাহর স্মরণ

---

[93] সহীহ মুসলিম, প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব অনুচ্ছেদ, নং: ৫৮৭১।

থেকে গাফেল করে না। বরং আল্লাহ এই ঔষধের মাঝে রোগের শিফা রেখেছেন বলে সে ঔষধ ব্যবহার করে আরো বেশি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতঃ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। এ হলো একজন মুমিন অসুস্থ হলে তার নিজের কাজ।

অপরদিকে এক মুমিন আরেক মুমিনের ভাই বলে কুরআন ও হাদীসে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই একজন মুমিন অসুস্থ হয়ে বিপদে পড়লে অপর মুমিনের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মুমিনকে একই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। একজন মানুষের একটি অঙ্গে ব্যথা হলে তার সমস্ত শরীর যেমন কষ্ট অনুভব করে তদ্রূপ একজন মুমিন ব্যথিত হলে প্রতিটি মুমিন তার ব্যথায় ব্যথিত হওয়া ঈমানের আলামত বলে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ».

(صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: ٦٧٥١)

"মুমিনদের দৃষ্টান্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, মমতা, আন্তরিকতার দিক দিয়ে একটি দেহের মত। তাদের

দেহের একটি অংশ আক্রান্ত হলে, তার সমগ্র অঙ্গ ব্যথা, যন্ত্রনা ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়।”[94]

এই হাদীস থেকেই কোনো মুমিন অসুস্থ হলে আরেক মুমিনের কি করণীয়, তার কতটুকু দায়িত্ব উপলব্ধি করা যায়। তথাপি এ হাদীস ছাড়া আরো অনেক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের অনেক করণীয় স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। একজন অসুস্থ মুমিনের আরেক মুমিনের উপর তাকে দেখতে যাওয়াকে অধিকার সাব্যস্ত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ». قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ...وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ». (صحيح مسلم، باب من حق المسلم على المسلم، رقم:٥٧٧٨)

“এক মুসলিমের অপর মুসলিমের উপর ছয়টি প্রাপ্য রয়েছে। বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল: সেগুলো কী? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ....আর

[94] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, মুমিনদের প্রতি দয়া, মমতা সহযোগিতা পরিচ্ছেদ, নং: ৬৭৫১, সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আদব, পরিচ্ছেদ: মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর দয়া করা, নং:৫৬৬৫।

যখন সে অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যাও, আর যখন সে মারা যায় তার জানাযায় অংশ নাও।”[95]

রোগীকে দেখতে যাওয়া বা তার সেবার ফযিলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع ».
(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل عيادة المريض، رقم: ٦٧١٧)

“যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত সে জান্নাতের ফলের মাঝে থাকে।”[96]

এভাবে রোগী দেখতে যাওয়া, তাঁর সেবা করা, এর ফযিলত সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখতে গিয়ে কী পড়বে এতেও নবীর সুন্নাত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে:

---

[95] সহীহ মুসলিম, মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের হক্ক পরিচ্ছেদ, নং:৫৭৭৮।

[96] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলাহ, রোগী দেখতে যাওয়ার মর্যাদা পরিচ্ছেদ, নং: ৬৭১৭।

" أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل على رجل يعوده فقال: "لا بأس طهور إن شاء الله" ".(صحيح البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم: ٥٣٣٨)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির কাছে তার রোগ দেখতে গেলেন। গিয়ে বললেন: কোনো অসুবিধা নেই, (ভাল হয়ে যাবে) পবিত্র হবে (রোগ গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে গোনাহ থেকে পবিত্র করবে) ইন-শা-আল্লাহ।”[97]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত দিক নির্দেশনা থাকতে এগুলো বাদ দিয়ে, বা এগুলো রেখে নতুন কিছু সংযোজন করে ‘খতমে শিফা’ নামে খতম বের করা হয়েছে যার কোনো ভিত্তি নেই। এর ফযিলতে যা বলা হয়েছে সবই মনগড়া। এই খতম রোগ নিবারণের খতম হলে আর অন্য কিছুর কি দরকার ছিল? রোগের জন্য কুরআন খতম, বুখারীর হাদীসের খতমকে অভিজ্ঞতার বাহানায় অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানানোর কি প্রয়োজন ছিল। অসুস্থ ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে না বুঝলে তাকে সঠিক বিষয় বোঝানোই ছিল একজন আলেমের দায়িত্ব। তাকে দীনের দা‘ওয়াত দেওয়ার এটি

---

[97] সহীহুল বুখারী, ইসলামে নবুওয়াতের আলামত পরিচ্ছেদ, নং: ৫৩৩৮।

ছিল একটি সুবর্ণ সুযোগ। তাকে দীনের সঠিক একটি শিক্ষাদান আমার মৃত্যুর পরও কাজে আসতো। এই দায়িত্ব আদায় না করে বরং তার অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তা করা কতটুকু অমানবিক কাজ তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই অমানবিক কাজকেই তার থেকে কিছু অর্থ উদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, একজন অসুস্থ মানুষ মানেই সে যে কোনো দিক থেকে বিপদগ্রস্ত। এই বিপদে আমাকে আমার সামর্থানুযায়ী তার সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রয়োজন ছিল। আজীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন। আমরা রাসূলের এই শিক্ষাতো গ্রহণ করছিই না, উপরন্তু বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরো বিপদ ও ঝামেলায় ফেলছি। তাকে সাহায্য না করে খতমের বাহানায় তার থেকেই আর্থিক সাহায্য নিচ্ছি। আল্লাহ আমাকে এবং সবাইকে হেদায়াত দান করুন। সাহায্য গ্রহণ না করে সাহায্য করার তওফিক ও মানসিকতা দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য যে, ‘খতমে শিফা’ নামের খতমের বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। যেমন, ‘ইয়া সালামু’ নির্দিষ্ট সংখ্যায় পড়া। এর কোনো ভিত্তি নেই। টাকার পরিমাণে ছোট দো‘আ, বড় দো‘আ, কম সংখ্যা, বেশি সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক সময়

পড়ার মাঝে কম বেশ করা আয়োজকের তদারিকের উপর নির্ভর করে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

খতমে তাহলীল

খতমে তাহলীল বা " لا اله الا الله " (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এর খতম। খতমে শিফার সাথেই তা পড়ার নিয়ম ও এর ফযিলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সবকিছুই মনগড়া, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

এই কালিমাটি হচ্ছে ইসলামে মূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের পুরো জীবনটাই এই কালেমার তাৎপর্য বুঝানো এবং এর তাৎপর্যের উপর সাহাবিদেরকে উঠানোর পিছনে ব্যয় করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত, তারা প্রথমে ঈমান অতঃপর কুরআন শিক্ষা করেছেন।[98] হাদীসে এই কালেমার যিকরকে সর্বোত্তম যিকর বলা হয়েছে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত :

> “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: সর্বশ্রেষ্ট যিকর ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং সর্বশ্রেষ্ট দো‘আ ‘আলহামদুলিল্লাহ’’।[99]

---

[98] ইবনে মাজাহ, হাদীস সহীহ, ঈমান অধ্যায়, ঈমানে একটি অনুচ্ছেদ, নং: ৬১।

[99] তিরমিযী, সুনান, হাদীস হাসান, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি তাঁর জীবনে কখনো সাহাবিদেরকে খতম নামের এসব কোনো কথা বলেননি বা শিক্ষা দেন নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে ঈমানের পিছনে অনেক মেহনত করে এই কালেমার তাৎপর্য তাদের অন্তরে বসালেও কখনোই তাদের থেকে এমন ধরণের কোনো শিক্ষা বা কথাবার্তা পাওয়া যায় না, এমনকি কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত বা খাইরুল ক্বুরুনের কোনো যুগেই এসবের কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই। অন্য মানুষ এই কালেমার খতম করে মৃত ব্যক্তিকে জান্নাতে বা স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়ার ধারণা মূলত বিধর্মী, ব্রাহ্মণী, পুরোহিতবাদি শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা যার সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দুত্ববাদের হাওয়ায় কোনো অজ্ঞ সুফি সাধক থেকে এই খতমের সুচনা হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজে এর বাস্তবতা পাওয়া যায়। আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আমাদেরকে এসব বুঝে এগুলোর খপ্পর

দো‘আ অধ্যায়, মুসলিমের দো‘আ গৃহীত অনুচ্ছেদ, নং: ৩৩৮৩, সহীহ ইবনে হিব্বান, আযকার অধ্যায়, নং:৮৪৬, সহীহু কুনুযিস্-সুন্নাতিন্-নাবাবিয়্যাহ, আল্লাহর যিকর অনুচ্ছেদ, ১/৯।

থেকে নিরাপদ রাখুন। কালিমার সঠিক মর্ম বুঝে আমল করা এবং এর দা‘ওয়াত দেওয়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে তাসমিয়া

'তাসমিয়া' শব্দের মূল অর্থ নামকরণ করা। মুসলিম ব্যক্তি যে কোনো কাজ আল্লাহর নাম নিয়েই শুরু করেন, তাই আল্লাহর নাম নেওয়া বা বিসমিল্লাহ বলার ক্ষেত্রেও শব্দটি প্রয়োগ হয়। এভাবে 'খতমে তাসমিয়া' বিসমিল্লাহ এর খতমকে বুঝানো হয়ে থাকে। একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" পাঠের মাধ্যমে এই খতম করতে হয়। এই খতমের বিবরণে লেখা হয়েছে:

> "এই পাক কালাম একলক্ষ পঁচিশ হাজার বার পাঠ করাকে "খতমে তাসমিয়া" বলে। কোনো কঠিন বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা কোনো মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার জন্য এই খতম অত্যন্ত ফলপ্রদ। অনেক লোক একত্রিত হয়ে একই বৈঠকে এই খতম পাঠ করিয়া আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন বা তাহার বাসনা পূর্ণ করেন।"[100]

---

[100] মোকছুদুল মো'মিনীন বা বেহেশ্তের পুঞ্জী, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। সাদনান পাবলিকেশন।

যে কোনো কাজ আল্লাহর নামে শুরু করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম। ‘‘পড় তোমার রাবব্ এর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’’[101] বলে ওহির সুচনাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন। ‘বিসমিল্লাহ’ ব্যবহারের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগের সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরামদেরকেও এর নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’ বলে রোগের ঝাড় ফুঁকের আমলও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায়। সাহাবী উসমান ইবন আবিল ‘আস আস-সাক্বাফী একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর শরীরের একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি তাঁর শরীরে এই ব্যথা অনুভব করছেন বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

« ضع يدك على الذى تألم من جسدك وقل باسم الله. ثلاثا.
وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ».

---

[101] সূরা আলাক্ব, আয়াত: ১।

(صحيح مسلم، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، رقم:٥٨٦٧)

"তোমার শরীরের যে জায়গায় ব্যথা রয়েছে সেখানে হাত রাখ এবং তিনবার 'بِاسْمِ اللَّه' বল। আরো সাতবার বল:

"أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ" (আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও তার কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)"[102]

এই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে 'বিসমিল্লাহ' এর শিক্ষা। সাহাবা, খাইরুল ক্বুরুন সবার জীবনেও এই একই শিক্ষা দেখতে পাবেন। এর বাইরে খতম নামে যা কিছু বলা হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভিত্তিহীন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবিদের জীবনে এই তাসমিয়া খতমের কোনো দৃষ্টান্ত নেই, কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত কোনো যুগেই এর কোনো নজীর নেই। এ সবকিছু তাদের যুগের অনেক পরের উদ্ভাবন। এছাড়া এই খতমের ফযিলতে যা কিছু বলা হয় সবই

---

[102] সহীহ মুসলিম, সালাম অধ্যায়, ব্যথায় আক্রান্ত স্থানে দো'আর সহিত হাত রাখা মুস্তাহাব পরিচ্ছেদ, নং:৫৮৬৭।

মনগড়া বানানো। আল্লাহ আমাদেরকে এ সমস্ত মনগড়া কর্ম থেকে রক্ষা করুন। 'বিসমিল্লাহ' এর মৌলিক শিক্ষায় আমাদের জীবন গড়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

খতমে খাজেগান

ফার্সি শব্দ 'খাজা' যার বহুবচন 'খাজেগাঁ'। খতমের নাম থেকেই তা যে অনারব কোনো সুফি থেকে আবিষ্কৃত তা সহজেই অনুমেয়। এই নামকরণের কারণে বলা হয়, ''পীর-পীরানগণের উপর দো'আ করা হয় বলিয়া এই খতমের নাম খাজেগান বা পীরান[103] রাখা হইয়াছে''।

খতমের নিয়মে লিখা হয়েছে:[104]

১. সূরা ফাতেহা ৭০ বার।

২. দুরূদ শরীফ ১০০ বার।

৩. সূরা 'আলাম নাশরাহ লাকা' ৭০ বার।

৪. সূরা ইখলাস ১০০০ বার।

৫. পুনরায় সূরা ফাতেহা ৭ বার।

৬. পুনরায় দুরূদ শরীফ ১০০ বার।

---

[103] নেয়ামুল কুরআন, মৌলবী শামছুল হুদা, রহমানিয়া লাইব্রেরী, একাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২০০।

[104] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা:১৯৯।

৭. নিম্নোক্ত দো‘আ ১০০ বার:

"فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل بفضلك يا عزيز".

(হে আল্লাহ নেক্কারগণের সরদারের (নবী সা.) সম্মানার্থে আমার প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করিয়া দাও, হে ক্ষমাশীল, তোমার দয়ায় সহজ করিয়া দাও।

৮. يا قاضي الحاجات (হে প্রয়োজন পূর্ণকারী) ১০০ বার।

يا كافي المهمات (হে বৃহৎ কাজ সমাধানকারী) ১০০ বার।

يا دافع البليات (হে বিপদ প্রতিরোধকারী) ১০০ বার।

يامجيب الدعوات (হে প্রার্থনা কবুলকারী) ১০০ বার।

يا رافع الدرجات (হে মর্যাদা বর্ধনকারী) ১০০ বার।

يا حلال المشكلات (হে বিপদ দূরকারী) ১০০ বার।

يا غوث أغثني وامددني (হে সাহায্যকারী আমায় সাহায্য ও মদদ কর) ১০০ বার।

انا لله وانا اليه راجعون (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং তার নিকটই আমরা ফিরে যাব) ১০০ বার।

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين (তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি গোনাহ্গার) ১০০ বার।

৯. সর্বশেষ দুরূদ একশত বার।

এই খতমের এই পদ্ধতি লিখিত হলেও যে যার মত সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, টাকা পয়সার কম বেশির দিকে বিবেচনা করে এদিক সেদিক যোগ বিয়োগ করে বানিয়ে খতম করেন। খতমকারীদের ভাষায় সটকার্ট খতম বা লং খতম। বানানো জিনিস একেকজন একেক রকম বানাবেন এটাই স্বাভাবিক।

এই খতমের ৭ নাম্বারে উল্লেখিত দো'আটি আপত্তিকর। আপত্তির কারণ ও পর্যায় একটু পরেই আলোচনা করছি ইনশাআল্লাহ। এ ছাড়া বাকী অনেকটি যেমন সুরা, দুরূদ মানসুস, যার নির্দিষ্ট ফযিলত রয়েছে। কিছু বাক্য যেগুলোতে আল্লাহকে সম্বোধন করা হয়েছে এই বাক্যগুলো দ্বারা আল্লাহকে ডাকা এবং নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা যাবে। ওযিফা হিসেবে তা পাঠ বা এতে ছওয়াব আছে মনে করা যাবে না, কেননা ছওয়াবের বিষয়টি সম্পূর্ণ তাওক্বীফি বা ওহি নির্ভর। এর বাইরে খতমের যে ধারা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর নির্দিষ্ট যে ফযিলত বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। মানসুস বা রাসূল সাল্লাল্লাহু থেকে প্রমাণিত আমলগুলো

তিনি যেভাবে করেছেন সেভাবেই করতে হবে এবং তিনি যে ফযিলত বলেছেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আমলের ক্ষেত্রে এর বাইরে কিছু বলার কারো কোনো অধিকার নেই।

এই খতমের ফযিলতে বলা হয়ে থাকে, কঠিন পীড়া ও বিপদাপদ হতে উদ্ধার লাভের জন্য ও প্রত্যেক প্রকার মনের বাসনা, পরীক্ষা পাস ও চাকরী লাভ করিবার জন্য এই খতমটি অদ্বিতীয়।[105]

এ সবকথাই ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দো'আ বা ইবাদত। এর ফযিলত একমাত্র তিনি বলতে পারেন যিনি এগুলো দিয়েছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল যেভাবে করলে যে ফযিলত বলেছেন তা সেভাবে করেই উক্ত ফযিলতের আশা করতে হবে। রাসূল কর্তৃক প্রদানকৃত রূপকে পরিবর্তন করা এবং সাথে সাথে নতুন ফযিলতের বুলি আওড়ানোর অধিকার কাউকে তিনি দেননি। আর এগুলো হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়। ধর্মীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা বলা অনর্থক।

৭ নং দো'আটি আপত্তিকর হওয়ার কারণ হলো, অন্যের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার ধারণা মূলত মুশরিকদের। ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া খ্রিস্টবাদী

---

[105] প্রাগুক্ত।

ধারণা। উযাইর আলাইহিস সালামের দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার আশা ইয়াহুদীবাদী ধারণা। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর মেয়ে হওয়ার ধারণায় তাদের মর্যাদার দোহাই দিয়ে পার হওয়ার ধারণা মক্কার মুশরিকরা লালন করত। কুরআন করীমে এসবের বিবরণ ও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জাতি আল্লাহতে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও শির্কে লিপ্ত হয়। ইসলাম এর মূলোৎপাটন করেছে। আল্লাহর বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো পদ্ধতিতে পালনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহরই দয়ায় পার পাওয়া যাবে বলে শিক্ষা দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে আজীবন এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। কুরআন ও হাদীসের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে দিলেই বিষয়টি সবার কাছে ফুটে উঠবে। কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত দো'আগুলো এবং দো'আর শিক্ষা থেকেও আমরা বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের দিক থেকে বান্দার শাহরগের চেয়েও অধিক নিকটে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[106] তাই আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে কোনো ব্যক্তি মিডিয়া

---

[106] সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৬।

এটি গ্রন্থকারের মত। আর এটা সত্য যে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আরশের উপর থাকা সত্বেও জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের সাথেই রয়েছেন। তবে বিশুদ্ধ তাফসীর মতে আলোচ্য আয়াতে 'আমরা' বলে ফিরিশতাদের বুঝানো হয়েছে। [সম্পাদক]

বা ব্যক্তির মর্যাদা মিডিয়া বানানোর প্রয়োজন ইসলাম বোধ করে না। আর এটাই ছিল সালাফে সালিহিনের আক্বীদা। ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন:

" لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها (الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة)."

“কারো জন্য উচিত নয় আল্লাহর কাছে তারই মাধ্যম ছাড়া দো‘আ করা। আর তাঁর নাম নিয়ে দো‘আর অনুমোদন ও নির্দেশিত হওয়ার দলীল আল্লাহর বাণী: “আর আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাকে এগুলোর মাধ্যমে ডাকো”।”[107]

‘তারই মাধ্যমে’ দো‘আর ব্যখ্যায় আল্লামা শামী লিখেন:

"(قوله إلا به) أي بذاته وصفاته وأسمائه".

---

[107] আল্লামা আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী, আদ্দুররুল-মুখতার, অবৈধ বৈধ অধ্যায়, বেচাকেনা অনুচ্ছেদ।

ড: আব্দুর রহমান আল-খুমাইছ, ই‘তিক্বাদুল আয়িম্মাতিল আরবা‘আহ, আক্বীদাতুল ইমাম আবু হানিফা। পৃষ্ঠা:৩। শামসুদ্দীন আফগানী (১৩৭২-১৪২০ হি.), জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়্যাহ ফি ইব্তালি আক্বায়িদিল ক্বুবুরিয়্যাহ (কবরপূজারীদের আক্বায়িদ বাতিল করতে হানাফী আলেমদের প্রচেষ্টা), ১/৩১, ২/১১২৪।

অর্থাৎ আল্লাহর সত্বা, তার গুণাবলী এবং তার নামের মর্যাদার ওসিলাতেই কেবল দো‘আ করা যাবে।

ফিক্বহে হানাফীতে আবু হানিফা রাহ. মাযহাব উল্লেখে বলা হয়েছে:

" (و) كره قوله (بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك) أو بحق البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى".

“এবং বলা মাকরূহ[108], তোমার রাসূলগণ, নবীগণ ও ওলীগণের অধিকারে অথবা বাইতুল্লাহর অধিকারে কেননা আল্লাহর উপর মাখলুকের কোনো অধিকার নেই।”[109]

আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও তার দুই বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রাহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনায় হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আবু জা‘ফর আত্ত্বাহাবী[110] রচিত আক্বীদার কিতাব

---

[108] উল্লেখ্য যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ ‘মাকরূহ’ শব্দ বলে হারাম বোঝাতেন। [সম্পাদক]

[109] আদ্দুররুল মুখতার, প্রাগুক্ত, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়্যাহ ফি ইব্তালি আক্বায়িদিল কুবুরিয়্যাহ, ১/৭, ২/১১২৬।

[110] হানাফী বিশিষ্ট ফক্বীহ আবু জা‘ফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ সালামাহ আত্ত্বাহাবী। বলা হয়, মিশরে ফিক্বহে হানাফীর নেতৃত্ব তাঁর কাছে এসে শেষ হয়েছে। তিনি

‘আল-আক্বীদাতুত্ত্বাহাবীয়্যাহ’ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা আবুল-ইয আল-হানাফী[111] লিখেন:

" قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام، ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة

প্রথমে ফিক্বহে শাফি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ফিক্বহি হানাফী গ্রহণ এবং এতে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করেন। জন্ম: ২৩৯, ওফাত: ৩২১ হিজরী, ৮৫৩-৯৩৩ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম ১/২০৬) তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ যা ‘আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ। তাঁর লিখিত আক্বীদার কিতাব ‘আল-আক্বীদাতুত্ত্বাহাবীয়াহ’ আরব ‘আজম সবখানে প্রসিদ্ধ ও পাঠ্য সিলেবাসভুক্ত। অনেকেই তর এ কিতাবের শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। তিনি তার এ কিতাব ইমাম আবু হানিফা (রাহ.) ও সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাহ.) এর আক্বীদা বর্ণনা করতে লিখেছেন বলে কিতাবের শুরুতেই নিজে উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্যটি এরূপ:

" هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين".(العقيدة الطحاوية، مقدمة، ١-١)

[111] আলী ইবন আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আবীল-‘ইয। ইবনু আবীল ‘ইয নামে প্রসিদ্ধ। দামেশ্‌কের বিশিষ্ট হানাফী ফক্বীহ। জন্ম: ৭৩১, ওফাত: ৭৯২হিজরী, ১৩৩১-১৩৯০ ঈসায়ী। (আল-আ‘লাম ৪/৩১৩)

وبمحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللّٰهُمَّ إني أسألك بمعقد العز من عرشك".

"আবু হানীফা এবং তার দুই সঙ্গী (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন: দো'আকারীর জন্য বলা মাকরূহ, "অমুকের অধিকারে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, অথবা তোমার নবী ও রাসূলগণের অধিকারে এবং বাইতুল হারামের অধিকারে এবং মাশ'আরে হারামের[112] অধিকারে।" এ জাতীয় আরো যা রয়েছে। এমনকি ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ

[112] মাশ'আরে হারাম অর্থ সম্মানী প্রতীক। বর্ণনার আলোকে কুরআনের মাশ'আরে হারাম বলতে মুযদালিফার মাঠ উদ্দেশ্য নিয়েছেন উলামায়ে কেরাম। কেউ কেউ শুধুমাত্র মুযদালিফার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছোট পাহাড়টি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। দেখুন: সহীহুল বুখারী, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: যারা পরিবারের দুর্বল লোকদের রাতে পাঠিয়ে দেয় (মুযদালিফা থেকে মিনায়) অতঃপর তারা রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করে এবং দো'আ করে..., নং: ১৫৯২, সহীহ মুসলিম, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: পরিবারের দুর্বল লোক মহিলা ও অন্যদেরকে মানুষের ভিড়ের পূর্বে রাতের শেষভাগের দিকে মুযদালিফা থেকে মিনায় পাঠিয়ে দেওয়া এবং অন্যরা ফজরের সালাত আদায় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করে যিকরে লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব, নং: ৩১৯০, আল্লামা আলুসী, রুহুল মা'আনী, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮, তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা বাক্বারা, আয়াত:১৯৮।

রাদিয়াল্লাহু আনহুমা মাকরূহ মনে করেন যে, লোকটি বলবে: “হে আল্লাহ, তোমার আরশের সম্মানিত আসনের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি”।”[113]

তিনি আরো লিখেন:

وتارة يقول: بجاه فلان عندك، يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه – لما خرجوا يستسقون -: «اللَّهُمَّ إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا». معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أنا نقسم عليك به، أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا

113 ইবনু আবীল ইয, শরহুল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়্যাহ, শাফা‘আত প্রসঙ্গ, ১/১৫৪।

لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. (شرح العقيدة الطحاوية، بحث: الشفاعة، ١-١٥٤)

“এবং অনেক সময় দো‘আ প্রার্থী বলে: ‘আপনার কাছে অমুকের যে সম্মান রয়েছে তার মাধ্যমে’ সে বলে ‘আমরা আপনার নিকট আপনার নবী, রাসূল ও ওলীগণকে মাধ্যম গ্রহণ করছি’, এর দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য, অমুক আপনার নিকট মান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই আপনি আমাদের দো‘আ কবুল করুন। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা যদি সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত থাকাকালে এ ধরণের মাধ্যম গ্রহণ করতেন তবে তাঁর মৃত্যুর পরও অবশ্যই নিতেন। অথচ তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তারা তাঁর দো‘আর মাধ্যম নিতেন। তারা তাঁর কাছে তাদের জন্য দো‘আর প্রার্থনা করতেন। তারা তাঁর দো‘আর উপর ঈমান রাখতেন, যেমন বৃষ্টি কামনা ইত্যাদির বেলায়। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন এবং তারা বৃষ্টি কামনার দো‘আর জন্য বের হলেন, তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

‘হে আল্লাহ, যখন আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হতাম তোমার কাছে তোমার নবীর মাধ্যমে দো‘আ করতাম, ফলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা (আব্বাস) এর (দো‘আর) মাধ্যম গ্রহণ করছি’। এর অর্থ হলো, তিনি আল্লাহর কাছে যে দো‘আ করেন, সুপারিশ করেন এবং প্রার্থনা করেন এর মাধ্যমে। তোমার কাছে তার শপথ এ উদ্দেশ্য নয়, অথবা আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তার সম্মানের মাধ্যমে যা তোমার কাছে রয়েছে এটাও উদ্দেশ্য নয়। কেননা যদি এ ধরণের মাধ্যম ধরা উদ্দেশ্য হত তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান সর্বাধিক এবং আব্বাসের সম্মান থেকে বেশি।”[114]

কুরআন হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী এই ছিল আবু হানিফা রাহ. সহ সমস্ত আসলাফের আক্বীদা বা বিশ্বাস। সালফে সালিহিনের আক্বীদা, বিশ্বাস, আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলেই আজ আমাদের মাঝে এমন অনেক কিছু বিস্তার লাভ করেছে যা তাদের

[114] শরহুল আক্বীদাতুত্তাহাবীয়্যাহ, প্রাগুক্ত, জুহুদুল উলামায়িল হানাফিয়্যাহ ফি ইবতালি আক্বায়িদিল কুবুরিয়্যাহ, ৩/১৫১২।

মাঝে ছিল না। তাদের আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার ফলেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত থেকে সরে গেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের আর আমাদের আমলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারতম্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের নমূনার উপর উঠার তওফিক দান করুন। সুন্নাতের বিপরীত যে কোনো ইবাদতের বেলায় জায়েয না-জায়েযের বাহাসে লিপ্ত না হয়ে চোখ বুঁজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাতকে সাহাবা ও সালফে সালেহিনের মত নেয়ার তওফিক দান করুন। হক্ব বোঝার জন্য প্রথমে আমার চক্ষু এবং আমাদের চক্ষু খোলে দিন। মুফতি ফয়জুল্লাহ রাহ. রচিত কবিতার দুটি পঙক্তি দিয়ে আলোচনাটি শেষ করছি। পঙক্তিদ্বয় এই:

هم مروج ایں دعاے خواجگاں ❁ از سلف منقول نے خوب داں

ان عبادت نیست باں اهتمام ❁مثل طاعت بدعت امد لا کلام

“প্রচলিত এই খাজেগাঁর দো‘আও, ভালভাবে জেনে রাখ এগুলো সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়,

এগুলো ইবাদত নয়, ইবাদতের মত এগুলোর গুরুত্ব দেওয়া নিশ্চিত বিদ‘আত।”[115]

---

[115] মুফতি ফয়জুল্লাহ, পান্দে নামাহ খাকী, দো‘আয়ে খাজেগাঁ অপ্রমাণিত, পৃষ্ঠা: ৩৪।

খতমে জালালী

আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে তার মূল নাম 'الله'। এই পবিত্র নাম বা ইসমে যাত নিয়ে তামাশার এক পদ্ধতির নাম খতমে জালালী। প্রথমেই দো'আ করি, যে অজ্ঞ ব্যক্তি এই খতম আবিষ্কার করেছে আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন। খতমের পদ্ধতিটি দেখলেই সচেতন ব্যক্তি যিনি ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা রাখেন তার কাছে এই খতমের খারাবী ধরা পড়বে। তবে যিনি ইলমের ধারক হওয়া সত্বেও দুনিয়ার লালসায় হাবুডুবু খাচ্ছেন, তিনি ধর্মের রক্ষা নয় বরং ধর্মই তাকে রক্ষা করছে এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন। খতমের পদ্ধতিটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

> ''নদী ভাঙ্গন বা ঐরূপ কঠিন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে এই নাম সোয়া লক্ষ বার কাগজে লিখিবে ও সোয়া লক্ষ ময়দার আটার গুলী তৈয়ার করিবে, গুলী তৈয়ার করার সময় 'আল্লাহু' এই নাম মুখে বলিবে, তৎপর আল্লাহর নাম লিখিয়া কাগজগুলি একটি করিয়া গুলীর মধ্যে ভরিবে, তৎপর গুলীগুলি নদী বা যে পুকুরে মাছ থাকে তাহাতে ফেলিয়া দিবে। সকলেই পাক সাফ অবস্থায় ওযুসহ এই আমল করিবে। নতুবা হিতে বিপরীত হইতে পারে। এই আমল দ্বারা বিপদ হইতে

উদ্ধার হইবে ও মতলব পূর্ণ হইবে। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আল্লাহর নামসমূহ ২ ভাগে বিভক্ত- জালালী (তেজস্বী) ও জামালী (সৌন্দর্যময়)। 'আল্লাহ' নাম জালালীর অন্তর্ভুক্ত; এই জন্য ইহার খতমকে খতমে জালালী বলা হয়।"[116]

পাঠক, এবার আপনি নিজেই এই খতমের ফায়সালা করুন। এই খতমের পদ্ধতিতে আল্লাহর যাতি নাম নিয়ে খেল তামাশা, নির্লজ্জ আচরণের সাথে সাথে এর ফায়েদায় যা কিছু বলা হয় তা সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ওহী ছাড়া এসব কথা বিশ্বাসে মুমিনের আক্বীদায় স্পট পড়ে। আলহাম্দুলিল্লাহ এমন অনেক আলেম পেয়েছি যিনি এই খতমের নাম ও পদ্ধতি শুনার সাথে সাথে "লা হাওলা..." পড়েছেন।

আবার অনেক এমন রয়েছেন যিনি একে অপছন্দ করেন তবে অংশ নেন। তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই, আপনি জানা সত্বেও কেন এসব খতমে উপস্থিত হন তাদের একই কথা, ভাই, আমার টাকার দরকার তাই যাই। আবার এমন অনেক আছেন যারা এটির পক্ষে সাফাই গান। বিভিন্ন যুক্তি ও হিলার মাধ্যমে এগুলোকে জায়েয রাখবার চেষ্টা করেন। স্বার্থের কারণে দ্বীনী বিষয়ের যে কোনো ব্যাখ্যা

---

[116] নেয়ামুল কুরআন, ১৯৮।

দেওয়া তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ব্যাখ্যা সঠিক নাকি ভুল এই বিষয় তাদের কাছে মূল্যহীন। এই কর্ম আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটিও উপেক্ষিত। অর্থই যেন তাদের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য। অথচ সম্পদের স্বার্থে ইলমের জোরে দীনের যে কোনো অপব্যাখ্যা ইয়াহুদী আলেমদের গুণ ছিল বলে আমাদের সকলের জানা। ইলমের দ্বারা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে দো'আ দুরূদের সুন্নাহ বহির্ভূত পদ্ধতি আবিষ্কার বা আবিষ্কৃত বিষয় জায়েয বানাবার অপচেষ্টা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণীর প্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যার মর্ম হচ্ছে: তার উম্মত বনী ইসরাঈলের পূর্ণ অনুসরণ করবে। এমনকি এক জোড়া জুতার মাঝে যেমন কোনো বেশ কম হয় না তার উম্মত ও বনী ইসরাঈলের উম্মতের মাঝে কোনো বেশ কম হবে না।[117] তাই আল্লাহর কাছে সর্বদা অশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত যে, আল্লাহ যেন আমাদেরকে কখনো এই তৃতীয় স্তরের আলেমদের মাঝে শামেল না করেন। আমাদের ঈমানকে দুর্বল করে দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে ও যেন না রাখেন। বরং এই তিন শ্রেণির আলেমের মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে প্রথম স্তরের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এই

[117] তিরমিযী, সুনান, উম্মতের দলাদলি অনুচ্ছেদ, নং: ২৬৪১, হাকীম, আল-মুসতাদরাদক 'আলাস-সহীহাইন, ফিতনা ও পরস্পর লড়াই অধ্যায়, নং:৮৪৪৮, ৪/৫১৬।

প্রথম শ্রেণির মত আমাদেরকেও সঠিক দীন বোঝার তওফীক দিন। টাকার স্বার্থে বুঝে না বোঝার বাহানার মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

খতমে দুরুদে মাহি

'মাহি' ফারসি শব্দ। যার অর্থ মাছ। বানানো একটি দুরূদকে 'দুরুদে মাহি' হিসেবে নামকরণের কারণ হিসেবে যে কাল্পনিক কাহিনীটি বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

> "হযরত রসূল (সাঃ) এর সময় একজন কামেল ব্যক্তি নদীর তীরে বসিয়া সর্বদা এই দুরূদ শরীফ পড়িতেন। ঐ নদীর একটি রুগ্ন মৎস্য ইহা সর্বদা শুনিতে শুনিতে শিখিয়া ফেলিল ও পড়িতে লাগিল। ক্রমে মৎস্যটির রোগ আরোগ্য হইতে লাগিল ও তাহার শরীরের রং বদলাইয়া সোনার বর্ণ ধারণ করিল। দৈবাৎ একদিন এক ইহুদী জেলের জালে মৎস্যটি ধরা পড়িল। ইহুদীর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়া মৎস্যটি কাটিতে পারিল না। অবশেষে উহাকে ফুটন্ত তৈলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মৎস্যটি নির্বিঘ্নে তৈলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ইহুদী অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল ও মৎস্যটিকে লইয়া হযরত রসূল (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (সাঃ) এর দোয়ায় মৎস্যটি বাকশক্তি লাভ করিল ও সমস্ত বিষয় হযরত (সাঃ) এর নিকট বর্ণনা

করিল। ইহা শুনামাত্র সেখানে উপস্থিত ৭০ জন ইহুদী তৎক্ষনাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন ও রসূল (সাঃ) এর নবুয়তের উপর ঈমান আনিলেন। তৎপর মৎস্যটিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উপরোক্ত কারণে এই দরূদ শরীফ 'দরূদে মাহি' তথা মাছের দরূদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা পড়িলে অতি মধুর শুনা যায়।"[118]

দুরূদটি নিমণরুপ:

" اللّٰهُمَّ صل على محمد خير الخلائق، أفضل البشر، شفيع الامة يوم الحشر والنشر سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ".

এই খতমের নিয়মে বলা হয়: ২১ দিনে বা ৪২ দিনে সোয়া লক্ষবার বর্ণিত দুরূদটি পড়া। এই নিয়মে এই খতম পড়লে নাকি

---

[118] নেয়ামুল কুরআন, পৃষ্ঠা:৪৩-৪৪।

হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। অযু সহকারে নদীর তীরে বসে পড়লে আরও বেশি দ্রুত ফল পাওয়া যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছ।[119]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়।

বর্ণিত দুরূদটি মাছুর তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং এটি কারো বানানো একটি দো'আ। তাই একে ওযিফা হিসেবে আমলে আনা যাবে না। তবে এতে কোনো আপত্তিকর শব্দ নেই। তাই কেউ ইচ্ছা করলে দো'আর উদ্দেশ্যেই তা পড়তে পারে।

এর যে পদ্ধতি ও ফযিলত বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া বানানো বক্তব্য। তাই মুমিন এ সবের পিছে পড়েন না এবং তা বিশ্বাস করেন না।

দুরুদে মাহি নামকরণের কারণে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা জালিয়াতদের বানানো সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মনগড়া, এ কাহিনীর কোনো সত্যতা নেই।

119 প্রাগুক্ত।

সূরা ইখলাস দ্বারা কুরআন খতম

নির্দিষ্ট সংখ্যার মাধ্যমে সূরা ইখলাসের খতম প্রচলিত না থাকলেও সূরা ইখলাস তিনবার পড়ার মাধ্যমে কুরআন খতমের প্রচলন রয়েছে। তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে পূর্ণ এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে অনেকের ধারণা। তাই অনেক সময় কুরআন খতম করতে অপারগ হলে তিনবার এই সূরা পাঠ করা হয়। বলা হয় হাদীসে রয়েছে, তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করলে এক খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যায়। অথচ এমন কোনো কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয় নি। রাসূলের হাদীসের সাথে যুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে এমন কথা বলা হয়। আর অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম পরিবর্তন হয়ে শরীয়তের বিকৃতি ঘটেছে।

কুরআন আল্লাহর পবিত্র কালাম। তার প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি সূরা বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ। আল্লাহর কালাম হিসেবে মর্যাদার দিক থেকে পুরো কুরআন এক সমান। তবে ভাব বা মর্মের দিক থেকে কোনো কোন আয়াত বা সূরার ফযিলত অন্যটির তুলনায় বেশি বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন। এরকম মর্যাদাপূর্ণ

একটি সূরা হচ্ছে সূরা ইখলাস। সুরাটিতে আল্লাহ তাঁর পরিচয় অত্যন্ত অল্প বাক্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। এই সূরার ফযিলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

"والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن". (صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب فضل قل هو الله أحد، رقم:٤٧٢٦)

"ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয় এটি (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের বরাবর।"[120]

আরেকটি হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

« أيعجز أحدكم أن يقرأ فى ليلة ثلث القرآن ». قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال « (قل هو الله أحد) يعدل ثلث القرآن». (صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب فضل قراءة قل هو الله أحد، رقم:١٩٢٢)

"তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে অক্ষম? সাহাবিরা বললেন, এক

[120] সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, "قل هو الله أحد" এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৬। উল্লেখ্য বুখারীর আরো একাধিক জায়গায় হাদীসটি রয়েছে।

তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়বে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

(قل هو الله أحد) এক তৃতীয়াংশের সমান।"[121]

এবার দেখুন, এই হাদীসের অর্থটিকে কীভাবে পরিবর্তন করে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যার কোনো বিবরণ সহীহে হাদীসে নেই। এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়া এবং তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার ছওয়াব পাওয়া কি এক? উলামায়ে কেরাম এই হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন যে, কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত তিনটি: আহকাম বা জীবন বিধান, আখবার বা সংবাদসমূহ, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের বিবরণ। সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা বা আল্লাহর

---

[121] সহীহ মুসলিম, কুরআন ফযিলত সমূহ অধ্যায়, "قل هو الله أحد" পড়ার ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ১৯২২,

সহীহুল বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, "قل هو الله أحد" এর ফযিলত পরিচ্ছেদ, নং: ৪৭২৭। উল্লেখ্য বুখারীর বর্ণনাটি সামান্য ভিন্ন। বর্ণনাটি এইরূপ,

" أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن ".

একত্ববাদকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে এক তৃতীয়াংশ বলেছেন।[122]

একেই কেউ কেউ এভাবে বলেন যে, কুরআনের অর্থ তিন ভাগে বিভক্ত। ঘটনাবলী, আহকাম, আল্লাহর গুণাবলী। সূরা ইখলাসটি আল্লাহর গুণাবলীতে বিশেষিত।[123] এভাবেও বলা যায় যে, পুরো কুরআনের আলোচনা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত নিয়ে। যে কোনো বিষয় এ তিনটির কোনোটির সাথে সম্পৃক্ত। আর সূরা ইখলাসে তাওহীদের আলোচনা অত্যন্ত নিপুণভাবে করা হয়েছে, তাই এ সূরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকেও এ অর্থেই এক তৃতীয়াংশ বলার কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن». (صحيح مسلم، المرجع السابق، رقم: ١٩٢٣)

---

[122] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত অধ্যায়, ৯/৫৯।

[123] ইমাম নাওয়াওয়ী, মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, প্রাগুক্ত অধ্যায়।

“আল্লাহ তা‘আলা কুরআনকে তিন অংশে বিভক্ত করেছেন। “قل هو الله أحد” (সূরা ইখলাস) কে কুরআনের তিন অংশের এক অংশ সাব্যস্ত করেছেন।”[124]

এই হাদীস থেকে উপরোক্ত মর্মটি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তবে কেউ কেউ এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য বলতে এক তৃতীয়াংশ পড়লে যে ছওয়াব হয় সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এই পরিমাণ ছওয়াব হয় বলে বলেছেন। কিন্তু এই মর্মটির কোনো দলীল নেই। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বারী’তে লিখেন:

" ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن وقيل مثله بغير تضعيف وهي دعوى بغير دليل ". (فتح الباري، كتاب التفسير، باب فضل قل هو الله أحد،٩-٦٠)

“আলেমগণের মধ্যে কেউ সমতুল্য অর্থটি ছওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে নেন এবং বলেন, এক তৃতীয়াংশ হওয়ার অর্থ এই সুরাটি পড়ার ছওয়াব পাঠকের জন্য ঐ ব্যক্তির সমান হবে যে এক তৃতীয়াংশ কুরআন

---

[124] সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, নং: ১৯২৩।

পড়েছে। এটাও বলা হয়ে থাকে, অতিরিক্ত ছওয়াব ব্যতিরেকে[125] মূল ছওয়াবের এক তৃতীয়াংশের সমান। তবে এই দাবীর সপক্ষে কোনো দলীল নেই।"[126]

এখানে লক্ষণীয় যে, একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ার ছওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই। একটি হাদীস থেকে এই মর্ম নেয়ার সামান্য সম্ভাবনা ছিল মাত্র, তবে মুসলিম শরীফের হাদীসের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাটির অবকাশ দূর হয়ে গেছে। তথাপি দূরবর্তী সম্ভাবনা অনুযায়ী আমরা যদি মেনে নেই যে, একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ পড়ার ছওয়াব পাওয়া যায় তবে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনবার সুরাটি তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশ তিনবার পড়ার ছওয়াব পাওয়া

---

[125] একথার মর্ম হল: যে কোনো নেক আমলের একটি মূল নেকী রয়েছে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার দয়ায় এই নেকী কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন বলে কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। এই হিসেবে পূর্ণ কুরআন একবার তেলাওয়াত করলে তার মূল এক ছওয়াব রয়েছে। তেলাওয়াতের মাঝে ইখলাস, গভীরতা ইত্যাদি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষে আল্লাহ তা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। একবার সূরা ইখলাস পড়লে এক তৃতীয়াংশের মূল ছওয়াব পাওয়া যাবে। অতিরিক্তটুকু নয়।

[126] ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত অধ্যায়, ৯/৬০।

যাবে। পূরো কুরআন একবার পড়ার ছওয়াব পাওয়া যাবে বলে কোনো ইঙ্গিত হাদীসে নেই। বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য মনে করুন, আপনার একটি কাজ আছে। যে কাজের তিনটি অংশ রয়েছে। এই কাজটি পূর্ণ করার উপর আপনার ১০০ টাকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে একটি অংশ করলে ২০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এখন কেউ যদি একটি অংশ তিনবার করে এবং এমনটি করার সুযোগ থাকে তবে আপনার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে ৬০ টাকা পাওয়ার কথা। এখন যদি সে দাবী করে যে, মোট অংশ তিনটি, আমি একটি অংশ তিনবার করেছি, সুতরাং আমি কাজটি পূর্ণ করেছি, তাই যুক্তির দাবী হলো আমাকে ১০০ টাকা দেওয়া হোক, এখানে আপনি তার এই যুক্তিকে কীভাবে দেখবেন? ঠিক তদ্রূপ একবার সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে এক তৃতীয়াংশের ছওয়াব মেনে নিলেও একবার পড়লে এক খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে এমন কথা যেমন নির্ভরযোগ্য হাদীস বহির্ভূত, তেমন যুক্তি বহির্ভূত। কোনো ইবাদত বা তার ছওয়াবের ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে কিছু বলার সুযোগ নেই, তথাপি অনেক দূরবর্তী একটি যুক্তির আলোকে আমাদের মাঝে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে কুরআন খতমের ছওয়াব অর্জনের কথা ও আমল অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত। এমনকি অনেকে পুরো কুরআন পড়ার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়েন যাতে করে ভুলভ্রান্তি কিছু হলে এর

মাধ্যমে তার ঘাটতি পূর্ণ হয়ে যায়, তারাবীর সালাতে অনেকে এই সূরা তিনবার পড়ে ঘাটতি পূর্ণ করেন, অথচ শরীয়তে এ সবের কোনো ভিত্তি নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, অন্যের জন্য খতম পড়তে গিয়ে ঘটনাক্রমে পড়া শেষ না হলে এই সূরা তিনবার পড়ে বেঁচে যাওয়ার বাহানা তালাশ করা হয়। খতমের আয়োজকের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এই সূরা তিনবার পড়ে নিলেই কাম সারে। এভাবে বিভিন্ন সুন্নাহ বিরোধী কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।

কেউ বলতে পারেন সূরা ইখলাসের বর্ণিত ফযিলতের ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, যেমন একটি হাদীসে এসেছে:

"من قرأ (قل هو الله أحد) ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع".

“যে ব্যক্তি قل هو الله أحد তিনবার পড়ল সে যেন পুরো কুরআন পাঠ করল।”[127]

[127] আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, (৮৪৯-৯১১ হিজরী, ১৪৪৫-১৫০৫ ঈসায়ী) জাম‘উল জাওয়ামি‘‘য়, মিম হরফের হাদীস, নং ৬২০১, আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাক্বী, (৮৮৮-৯৭৫ হিজরী, ১৪৮৩-১৫৬৭ ঈসায়ী) কানযুল উম্মাল,১/৫৯৮।

এ হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য। এর কোনো নির্ভরযোগ্য সনদ নেই।[128] এ হাদীস ছাড়াও উক্ত সূরা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা ও বিশাল ফযিলতের কথা সহ আরো কিছু হাদীস রয়েছে যার নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ বা ভিত্তি নেই। হাদীসের সাথে যাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে তারা জানেন যে, অন্যের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে নিসবত বা সম্পৃক্তের একটি দিক হচ্ছে, অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিভিন্ন মর্ম বা ব্যাখ্যা মানুষ তাদের জ্ঞান বা মেধা থেকে বর্ণনা করে থাকেন। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারী নিজে অথবা অন্য কেউ উক্ত ব্যাখ্যা বা মর্মকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অনেক জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ এভাবেই ঘটেছে। আল্লামা সুয়ুতী মনে করেন জাল হাদীসের এই প্রকারটি সর্বাধিক।[129] নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য কোনো সনদ না থাকায় বর্ণিত হাদীসটিও এই ধরণের বলে সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনার তওফীক দান করুন। আমীন।

---

[128] নুরুদ্দীন আলী ইবনু আবু বাকর আল-হাইসামী, মাজমা'উয্যাওয়ায়িদ, সূরা "قل هو الله أحد" এবং এবিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, নং:১১৫৪০, আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ্দা'য়ীফাহ, ১০/১৩৬, নং: ৪৬৩৪।

[129] সুয়ূতী, তাদরীবুর-রাবী, জালিয়াতের প্রকার, ১/২৮৭।
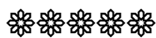
অভিজ্ঞতা বনাম ধর্মীয় অনুভূতি

উল্লেখিত প্রচলিত খতমসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বহির্ভূত খেলাফে সুন্নাত স্বীকার করা সত্বেও তা জায়েয বা এতে কোনো সমস্যা নেই এর পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় তা হলো, অভিজ্ঞতা। আলেমগণের এক শ্রেণি ঈসালে ছওয়াবের খতমে অংশ নিলেও তা বিদ‘আত মনে করেন। কেননা তারা জানেন যে, খাইরুল ক্বুরুনে খতমের মাধ্যমে ঈসালের কোনো পদ্ধতি ছিল না, তবে তারা ঈসালে ছওয়াব ছাড়া অন্যান্য সমস্যার কারণে যে কোনো খতম করতে কোনো সমস্যা নেই বলে মনে করেন। তাদের যুক্তি হলো, এটি একটি তাজরিবাহ বা অভিজ্ঞতার বিষয়। এর সাথে বিদ‘আতের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা বিদ‘আতের সম্পর্ক ইবাদতের সাথে। খতম যদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে না করা হয়, বরং রোগমুক্তি বা অন্য উদ্দেশ্যে করা হয় তবে নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগুলো বিভিন্ন বুযুর্গের অভিজ্ঞতা মাত্র। অভিজ্ঞতার আলোকে অমুক খতমে অমুক ফল দেখা গেছে, তাই আমরা সেই আশায় খতম পড়ছি।

যে কোনো খতম পড়তে কোনো সমস্যা নেই একথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা আমরা খতমের আলোচনায় বুঝতে পেরেছি। এবার

হলো যে খতমে শব্দগত কোনো আপত্তি নেই তার কথা। অভিজ্ঞতার আলোকে এমন খতমাদিকে শুদ্ধ বলে চালানো কতটুকু গ্রহণযোগ্য? মূলত অভিজ্ঞতা ও ধর্মীয় অনুভূতি দুটি বিষয়কে এক করে দেওয়ার ফলে আমরা এমন কথা বলি, অথচ দুটি বিষয়ে আকাশ পাতাল ব্যবধান। ইবনে তাইমিয়া রাহ.[130] বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর আলোচনা পেশ করার আগে সহজেই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মূলত কোনো জিনিসের সাথে বারংবার সম্পৃক্ত হওয়া, সেই বস্তুকে নিয়ে গবেষণা, পরীক্ষা নিরিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত বস্তুর ভিতর বাস্তব যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় তাকে বলে অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কিছু প্রমাণিত হলে তা উক্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য। তাই তা অস্বীকারের কারো কোনো উপায় নেই। পাগল ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। কেউ স্বীকার করুক বা নাই করুক, বিশ্বাস করুক বা নাই করুক, উক্ত বস্তু তার কাজ

---

[130] শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবন আব্দুল হালীম তাক্বীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া। জন্ম: ৬৬১ হিজরী মোতাবেক ১২৬৩ ঈসায়ী, ওফাত:৭২৮ হিজরী, মোতাবেক ১৩২৮। তিনি মূলত হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাফসীর ও উসুলে তাকে ‘আয়াত’ নিদর্শন বলা হত। (আল-আ‘লাম:/১৪৪) সমস্ত বিশ্বের আলেমদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা, সহীহ আকীদার দওয়াত, প্রচার, প্রসারের ক্ষেত্রে তার তুলনা অত্যন্ত দুর্লভ।

করেই যাবে। এখানে ধর্মের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ধরুন, আগুনের ভিতর জ্বালানোর বৈশিষ্ট্য মানুষ প্রথমে অভিজ্ঞতার আলোকেই পেয়েছে। আগুন জ্বালায় এ কথা সবাই মানেন। এভাবে যে কোনো রোগের ঔষধ অনেক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অমুক ঔষধ খেলে অমুক রোগ ভাল হওয়ার বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সেই ঔষধে রেখেছেন। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হলে মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই তা স্বীকার করেন। কেননা এটা সেই বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাই অভিজ্ঞতা সঠিক হলে সবাই তা স্বীকার করতে বাধ্য। অপরদিকে ধর্মীয় অনুভূতি এমন যা একজন বিশ্বাস করলে অপরজন করেন না। যেমন ধরুন, একটি অত্যন্ত সুন্দর পাথর, হিন্দু ধর্মের ব্যক্তি তাকে খুবই শ্রদ্ধা করছেন। তিনি বলছেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই পাথর থেকে এই ফল পাওয়া যায়, এর অসম্মান করলে এই ক্ষতি হয়। অপর ব্যক্তি যিনি এই ধর্মে বিশ্বাসী নন তিনি এই পাথরকে লাথি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কেননা হিন্দু ব্যক্তি যে বিশ্বাস পোষণ করেন তিনি তা করেন না। পাথরকে লাথি মারলেও তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। হিন্দু ব্যক্তির কথাটি বাস্তব হলে লাথি মারলে এই ব্যক্তিরও ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল। এখানে হিন্দু ব্যক্তির ধারণাকে আমরা অভিজ্ঞতা বলতে পারি না। বরং তা তার একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। সে যদি পাথরকে শ্রদ্ধার কারণে কোনো লাভ, অপমান করার কারণে

কোনো ক্ষতির বাস্তব ঘটনা শুনায় তবুও মুসলিম তা উড়িয়ে দিবেন, এমনকি তা নিয়ে হাসির কৌতুকও রচনা করতে পারেন। তিনি বলবেন মূলত লাভ ক্ষতি অন্য কারণে হয়েছে, হিন্দু ব্যক্তির বিশ্বাস তাকে এদিকে টেনে নিয়ে গেছে। এই হলো অভিজ্ঞতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য।

এভাবে যে ব্যক্তি মাজারে নিয়মিত আসা যাওয়া করে, মাজারকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাকে আপনি এর খারাবী বুঝাতে চেষ্টা করলে বা এখানে এসে কোনো লাভ নেই বললে সে আপনাকে তার অনেক লাভ দেখিয়ে দিবে। সে বলবে আমি এই পেয়েছি, সেই পেয়েছি। শাহজালাল বাবার কাছে চাইলে পাওয়া যায় বলে আমার কাছে অনেক প্রমাণ রয়েছে। এ কথাগুলো কোনো কাল্পনিক বা ধরে নেওয়ার ভিত্তিতে নয় বরং বাস্তব। আমার নিজ কানে সিলেটের অনেককেই বলতে শুনেছি, এত লোক কি এখানে এমনিতেই আসে? নিশ্চয় তারা কিছু পায়। আমাদের ঘরের জিনিস তাই আমরা এর ক্বদর তথা মূল্যায়ন করি না। এখানে সে তাঁর অভিজ্ঞতা দেখালেও সহীহ আক্বীদা পোষণকারী মুসলিম তা বিশ্বাস করেন না। মাজার বিশ্বাসী লোকটির এমন কথা আপনার হাসি ও আক্ষেপকেই বৃদ্ধি করে। আপনি এটিকে তাঁর একটি বোকামী বলেই দেখছেন। কেননা এটা তাঁর মনের তৈরী একটি বিশ্বাস যার কোনো প্রমাণ নেই।

প্রথমে বিশ্বাস তৈরীর পর সে তাঁর লাভ ক্ষতিকে মাজার কেন্দ্রিক টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে যতই অভিজ্ঞতার কথা বলুক না কেন আপনাকে তা বিশ্বাস করাতে পারবে না। তার কারণ হলো, এটাকে অভিজ্ঞতা নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এটিও তাঁর একটি ধর্মীয় অনুভূতি বা বিশ্বাস। এভাবে হাজারো উদাহরণ আপনি নিজেই চিন্তা করলে বের করতে পারবেন, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার নাম দিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কুরআন হাদীসের বিপরীত যত ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে তার অধিকাংশই এ পর্যায়ের।

আরেকটি উদাহরণ দেখুন: 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করলে খাবারের মাঝে বরকত হয় বলে আমরা মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি। কেননা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলে গেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ব্যক্তি নবী বলে অস্বীকার করে সে এটি বিশ্বাস করবে না। মুসলিম ব্যক্তি বাস্তবে এই বরকত উপলব্ধি করলেও তিনি এখানে অভিজ্ঞতার দলীল দিতে পারেন না। কেননা এটা অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। অভিজ্ঞতার বস্তু হলে মুসলিম অমুসলিম সবাই তা বিশ্বাস করতে বাধ্য। বরং এটি মুসলিম ব্যক্তির একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলার কারণে তিনি এই বিশ্বাস পোষণ করেন।

আল্লাহ বা রাসূল ছাড়া অন্য কেউ বললে এই একই ব্যক্তি তা উড়িয়ে দিতেন। কেননা ওহী ছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করা যায় না। ওহীর বাইরের আক্বীদা মানেই ভ্রান্তি। ধরুন আমি বুযুর্গির এক পর্যায়ে পৌছে যদি বলি 'ক্বুল হুয়াল্লাহু...' পড়ে খাবার শুরু করলে খাবারে বরকত হয়। এখন দেখা যাবে আমার কিছু অন্ধ ভক্ত একথা বিশ্বাস করবেন এবং তারাও এর আলোকে আমল শুরু করবেন। একথা বিশ্বাস করতে কোনো সমস্যা নেই দাবী করে দলীল হিসেবে বলবেন, এটা উনার অভিজ্ঞতা। তবে যিনি মুহাক্কিক আবার অন্ধ ভক্ত নন, বরং শরীয়তের সীমার ভিতরে থেকে ভক্তি করেন, তিনি এ কথা মেনে নিবেন না। কেননা তিনি জানেন যে, এটা অভিজ্ঞতার বিষয় নয়। এখানে একটি বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতার নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। ওহীর বাইরে এমন কথা তিনি মেনে নিবেন না। তবে 'বিসমিল্লাহ' এর বরকত ওহী দ্বারা প্রমাণিত, তাই তিনি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং আমল করেন। আশাকরি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার মাঝে পার্থক্য বুঝতে আর কোনো উদাহরণের প্রয়োজন নেই। এবার পাঠক নিজেই বিভিন্ন খতমের ব্যাপারে ফায়সালা করুন। এই খতমে এই হয়, সেই খতমে সেই হয়, তা কি অভিজ্ঞতার বিষয়? না কি একটি ধর্মীয় বিশ্বাস? দ্বিতীয়টি হলে - আপনি অন্ধ ভক্ত না হলে এটাই আপনার কাছে বাস্তব- ওহী ছাড়া আমরা এমন বিশ্বাস ও তার উপর আমল কীভাবে করতে পারি?

একটি ঘটনা দেখুন: চট্টগ্রামের জনৈক ব্যক্তি লন্ডন বসবাস করেন। দেশে আসলেই তিনি সিলেট আসেন এবং শাহজালাল রাহ. এর মাজার যিয়ারত করেন। দেশে আসলে কোনো বারই নাকি তাঁর এই সফর মিস হয় না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ভাই আপনি কেন আসেন? এর প্রতি উত্তরে লোকটি বলল, ‘‘বাবা আঁরে লন্ডন ফাটাইয়ি ইতাল্লাই আঁই ফতিবার এডে আঁই’’ অর্থাৎ শাহজালাল বাবা আমাকে লন্ডন পাঠিয়েছেন, তাই আমি প্রত্যেকবার তথা দেশে আসলেই এখানে আসি। লোকটির বিশ্বাস দেখুন। সে তাঁর এ কথাগুলো অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছে। কেননা সে এখানে এসেছে এবং লন্ডন যাবার জন্য দো‘আ করেছে এবং যেতে পেরেছে। একজন সহীহ আক্বীদা পোষণকারী হিসেবে আপনি লোকটির এই কথাগুলো কিভাবে নিবেন? আপনি সহীহ আক্বীদা পোষণকারী নিশ্চয় বলবেন, তার লন্ডন যাবার অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ার যাবতীয় জরুরী কাগজপত্র, ভিসা, পাসপোর্ট ইত্যাদি শর্ত মোতাবেক হয়েছে বলে অল্লাহর ইচ্ছায় সে যেতে পেরেছে| লন্ডনের অনুমোনের শর্তাদি পুরো না হলে একবার কেন শতবার মাজারে আসলেও সে যেতে পারত না| কিন্তু এমন লোককে যদি আপনি বলেন: ভাই, এখানে শাহজালাল সাহেবের কী সম্পর্ক? আপনার তো লন্ডন যেতে পারা যাবতীয় শর্তাদি সঠিকভাবে পূরণ হওয়ার কারণে হয়েছে, সে বলবে, কাগজপত্র সবকিছু বাবার ওসীলায় ঠিক হয়েছে। এভাবেই

অতিভক্তির মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাসের ধোকায় নিপতিত হয়। অতিভক্তি তার বিশ্বাসকে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যায়। বাস্তবতা থেকে অবাস্তবতার দিকে নিয়ে যায়, অথচ সে টেরই পায় না। আমাদের অবস্থা এমন হচ্ছে কি না তা নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। দীনের জন্য একটু ভাবলে ক্ষতিই বা কী? বরং এতে আমার অনেক লাভ রয়েছে। আমি সঠিক পথে থাকলেও ভাবার কারণে নিশ্চয় ছওয়াব পাব।

এবার আমরা ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর বক্তব্যটি উপস্থাপন করছি। তিনি লিখেন:

> " ثم قد يكون سبب قضاء حاجة هؤلاء الداعين الدعاء المحرم؛ لشدة ضرورته لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله –تعالى ". (المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم١-٩٦)

> “এরপর অনেক সময় এসব প্রার্থনাকারী যারা হারাম প্রার্থনা করে তাঁর কঠিন প্রয়োজনের কারণে আল্লাহ তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করেন, যদি কোনো মুশরিক একটি মূর্তির কাছে গিয়ে এই প্রয়োজনের প্রার্থনা করত তাঁর

প্রার্থনা ক্ববুল করা হত, কেননা (সে মূর্তির কাছে হলেও) তার পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহর দিকে।”[131]

ইবনে তাইমিয়া রাহ. এখানে যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রার্থনাকারী হারাম বস্তু কামনা করছে। আল্লাহ তার মনের আহাজারী, কাতর অবস্থা দেখে এমন প্রার্থনাও শুনছেন। তবে এই বস্তু পেয়ে যাওয়া তাঁর কামনা জায়েয হওয়ার দলীল নয়। এভাবে মূর্তির কাছে গিয়েও সে যে প্রার্থনা করে, তাঁর কান্নাকাটি, আহাজারী, মনের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তার দো'আ শুনেন। তবে দো'আ কবুল করা মূর্তির কাছে যাওয়ার কারণে নয়, বরং তার মনের করুণ অবস্থার কারণে। কিন্তু প্রার্থনাকারী লোকটি তার বিশ্বাসকে মূর্তির দিকে নিয়ে গিয়ে ফিতনায় পতিত হয়। সে মনে করে মূর্তির কাছে এসে কিছু চাইলে পাওয়া যায়।

তিনি আরো লিখেন:

ومن هنا يغلط كثير من الناس يبلغهم أن بعض الأعيان الصالحين عبد عبادة، أو دعا دعاء وجد أثره، فيجعل ذلك دليلا

[131] ইব্নু তাইমিয়া, আল-মানহাজুল ক্বাওয়ীম ফি ইখতিছারি 'ইক্বতিদ্বায়ুসসিরাতিল মুস্তাক্বীম', কিছু বস্তুর প্রতিক্রিয়ার আলোচনা যা অনেক সময় কম জ্ঞানী ও দুর্বল ধার্মিক ব্যক্তির জন্য ফিতনা হয়, এমনকি তার জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়ে যায়, ১/৯৬।

على استحباب تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط عظيم لما ذكرناه خصوصا إذا كان العمل إنما كان أثره بصدق قام في قلب فاعله حين الفعل ثم تفعله الأتباع صورة، فيضرون به.

‘‘এখান থেকেই অনেক মানুষ ভুলের মধ্যে পতিত হয়, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছে, কোনো নেক মানুষ একটি ইবাদত করেছেন, অথবা একটি দো‘আ করে তার ফল পেয়েছেন, অতঃপর এটিকে ঐ ইবাদত এবং দো‘আ মুস্তাহাব হওয়ার দলীল বানিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা সেই আমলটিকে সুন্নাত বানিয়ে নেয়, যেন তা কোনো নবী করেছেন। আর এটা মারাত্মক ভুল যা আমরা উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে যখন আমলটির ফল কর্মের সময় আমলকারী মনের নিষ্ঠার কারণে ছিল, পরবর্তীতে অনুসারীরা শুধুমাত্র বাহ্যিক আমল হিসেবে তা করে থাকে, ফলে তারা এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’’[132]

---

[132] প্রাগুক্ত, ১/৯৭।

পাঠক, আশা করি ইবনে তাইমিয়া রাহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোনো বুযুর্গ কোনো দো'আর আমলের মাধ্যমে কিছু পেলে আমরা তা সেই দো'আর প্রতিফল ভাবতে পারি না। কেননা ওহী ছাড়া এমন কথা বলা যায় না। তবে নেক বুযুর্গ তিনি যে প্রতিফল পেয়েছেন এটা মূলত তার মনের অবস্থার প্রতিফল। যে কোনো মুমিন মনের আবেগ নিয়ে সকাতরে আল্লাহর কাছে যেই দো'আ করুক না কেন আল্লাহ তার প্রতিফল দিবেন। এমনকি সকাতরে কাফের ব্যক্তিও যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায় আল্লাহ তার প্রতিফল দেন বলে কুরআনে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন।[133]

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বস্তু উপলব্ধি করার তওফিক দান করুন। শুধুমাত্র সুন্নাতের মধ্যেই সফলতা দেখার তওফিক দান করুন। আমীন।

আমাদের জানামতে সমাজে কম-বেশ যে খতমগুলো রয়েছে, বা যে দো'আ দুরূদগুলো খতম হিসেবে পড়ার প্রথা রয়েছে সেগুলো নিয়ে সামান্য পর্যালোচনা করলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু মূলত সমাজে বা আমাদের মাঝে প্রচলিত খতম নিয়ে। তাই অন্যান্য

---

[133] দেখুন: সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৫, লুক্বমান, আয়াত: ৩২।

বানানো আরো কিছু আমল যেগুলোর প্রচলন রয়েছে তবে তা আমাদের সমাজে খতম হিসেবে প্রসিদ্ধ নয়, সেগুলোর আলোচনা করা হয় নি। **যেমন : দুরুদে তাজ, দুরুদে হক্কানী, দুরুদে তুনাজ্জিনা, দুরুদে ফুতুহাত, দুরুদে রু'ইয়াতে নবী, দুরুদে শিফা, দুরুদে খাইর, দুরুদে আকবার, দুরুদে লাখি, দুরুদে হাজারী, দুরুদে রুহি, দুরুদে বীর, দুরুদে শাফিয়ী, দুরুদে গাওসিয়া, দুরুদে মুহাম্মাদী...**। এসব দুরূদ পরবর্তী যুগের মানুষের বানানো। অতএব এগুলোর ফযিলতে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।[134] তাছাড়া এগুলোর অনেকটির মধ্যে কিছু কিছু আপত্তিকর শব্দও বিদ্যমান। আপত্তির পর্যায়টি না-জায়েয ক্ষেত্র বিশেষে শির্ক পর্যন্ত রয়েছে। তাই এগুলোর চটকদার লাভের গল্প শুনেই তার পিছে না পড়া জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ। এগুলোতে আমার আপনার বুযুর্গের ছোঁয়া থাকলেও নবুওয়াতের নুর নেই। তাই নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দুরূদ ও দো'আর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখাই নিরাপদ। তাযকিয়ার চূড়ান্তে পদচারণা করতে তাঁর শিখানো দুরূদ ও পদ্ধতিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের ভিতর থেকেই

---

[134] প্রখ্যাত হাদীস গবেষক ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির, হাদীসের নামে জালিয়াতী, পৃষ্ঠা: ৬২০।

দুনিয়ায় থাকাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছিলেন। তারা যেমন সুন্নাতের বাইরে কিছুই ভাবতে পারেন নি, আমরাও তাদের আদর্শের দাবীদার হলে তাযকিয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাতানো ওযিফার বাইরে কোনো ওযিফা ভাবতে পারি না। বিপদে আপদে আল্লাহর শরণাপন্ন হতে তাঁর আদর্শ ও পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে শরণাপন্ন হতে পারি না। তাঁর বাতলানো পদ্ধতির মাধ্যমে শরণাপন্ন হলেই আল্লাহ আমাদের কথা দ্রুত শুনবেন বলে আমরা আশাবাদী। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তো একারণেই আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা কিভাবে, কিসের মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রার্থনা করব, কোন পদ্ধতিতে কোন আমলে তাঁর নৈকট্য লাভ করব সেটা আমাদের তিনি জানাবেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শের গণ্ডির ভিতর রাখুন। আমীন।

পরিশেষ

সম্মানিত পাঠক, আবারো নিজের ইলমী দুর্বলতা ভাষাগত অক্ষমতা স্বীকার করত আপনাদের কাছে বিশেষ করে আলেমদের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের এই আলোচনা পর্যালোচনা কারো সম্মান বিঘ্নিত করার উদ্দেশ্যে নয়। কারো সম্মান এবং তার অনুসরণ এক নয়। সবার সম্মান করতে হবে, আমরা এর জন্য নির্দেশিত। অপরদিকে আক্বাঈদ বিশ্বাস বা ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে "ما أنا عليه وأصحابه" এর বাইরে যাওয়া যাওয়া যাবে না বলে আমরা আদেশপ্রাপ্ত। এর বাইরে গেলেই আমরা আহলুস্-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বাইরে চলে যাব বলে সর্বদা আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মহোদয়গণ এবং আকাবীর আসলাফরা সতর্ক করে আসছেন। যুক্তি, বিবেক, জ্ঞান, ইলমের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে এর বাইরে যাওয়া থেকেই বিভ্রান্তির শুরু। তাই নিজ জ্ঞান দিয়ে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়কে যাচাই করে দেখাকে নিরাপদ মনে করতে পারি না। নিরাপদ মনে করি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা কর্মের পূর্ণ অনুসরণ। আমাদের একটাই কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আক্বীদা পোষণ করতেন কি না? তিনি এই ইবাদত এই পদ্ধতিতে বা এই উদ্দেশ্যে করেছেন কি না বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন কি না? তিনি করলে বা নির্দেশ দিলে আর কোনো

ঝুঁকি নেই। যে সব আলেমে দীন, আসাতিযা থেকে এভাবে সুন্নাতের অনুসরণ শিখেছি তাদের কেউই আমার এই ক্ষুদ্র পরিশ্রমে দুঃখিত হবেন না বলে আমি শতভাগ আশাবাদী। বরং তারা খুশি হয়ে দো'আ করবেন। তাদের দো'আ ও সহযোগিতায় এই সামান্য খেদমতের ফায়েদা ব্যাপক হবে বলে আমি পূর্ণ আস্থাবান। আর যারা অনেক বড় আলেম, যারা তাদের জ্ঞানের উপর পূর্ণ আস্থা করত রাসূলের কর্ম বহির্ভূত পদ্ধতিকে দলীল (?) দিয়ে জায়েয করতে পারেন তাদের কাছে আমার সবিনয় আবেদন যে, আপনারা আমাদের মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসারীদের পূর্ণ অনুসরণের ওজুহাতটি কবুল করে আমাদেরকে, বিশেষ করে আমি নাদানকে আপনাদের দো'আয় শামিল রাখবেন। পরিশেষে সবার কাছে দো'আ চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্বকবুল করুন। সুন্নাতকে জলাঞ্জলি না দিয়ে সুন্নাতের জন্য নিজেকে জলাঞ্জলি বা বিলিয়ে দেওয়ার তওফিক দিন। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জি

রচনাটি লিখতে যে সমস্ত কিতাবের উপর মূলত নির্ভর করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর মোটামুটি তালিকা, কিতাবের মুসান্নিফের নাম সহ নিম্নে প্রদান করা হলো। সালাফিয়্যাত বা সিনিয়ারিটির মূল্যায়নের লক্ষ্যে মুসান্নিফদের ওফাত সন উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত 'আল-মাকবাতুশ্ শামিলাহ' দ্বিতীয় প্রকাশনীর উপর নির্ভর করা হয়েছে। তবে পাঠককে যাতে যে কোনো তথ্য বের করতে বেগ পেতে না হয় তাই শুধুমাত্র খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং বা হাদীস নম্বরের উপর নির্ভর না করে হাদীস বা অন্যান্য তথ্যের অধ্যায় অনুচ্ছেদ উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে হাদীসের নাম্বার উল্লেখের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরণ, তাই পাঠক এক্ষেত্রে শুধুমাত্র নাম্বারের উপর পূর্ণ নির্ভর না করে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করবেন।

1. আল-কুরআনুল করীম।
2. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি.) মুসনাদে আহমদ।
3. মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি.) সহীহুল বুখারী।
4. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি.), সহীহ মুসলিম।

5. সুলায়মান ইবনু আশআস আবু দাঊ আস-সিজিস্তানী (২৭৫ হি.), আস-সুনান।
6. মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ (২৭৫ হি.), আস-সুনান।
7. আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (২৭৯ হি.), আস-সুনান।
8. আহমদ ইবনু শুয়াব নাসায়ী (৩০৩হি.), আস-সুনান।
9. ইবনু খুযায়মাহ (৩১১ হি.), সহীহ ইব্নু খুযায়মা।
10. আবু জা'ফর ত্বাহাবী (৩২১ হি.), আল-আক্বীদাতুত্-ত্বাহাবিয়্যাহ।
11. ইবুন হিববান (৩৫৪ হি.), সহীহ ইবনু হিববান।
12. আবুল কাসেম তাবারানী (৩৬০ হি.), আল-মু'জামুল কবীর।
13. আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি.) মু'জামু মাক্বায়িসিল লুগাহ।
14. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাপুরী (৪০৫ হি.), আল-মুসতাদরাক 'আলাস্সহীহাইন।
15. মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন সাহাল আস্-সার্খাসি (৪৮৩ হি.), আল-মাবসুত।
16. বুরহানুদ্দীন ইবনু মাজাহ (৬১৬ হি.), আল-মুহিত্বুল বুরহানী।

17. হাফিজ মুনযিরী (৬৫৬ হি.), আত তারগীব ওয়াত তারহীব।
18. ইমাম নববী (৬৭৬ হি.), শরহু সহীহ মুসলিম।
19. ইবনু মানযুর ৭১১ হি. লিসানু আরব।
20. ইবনু তাইমিয়া (৭২৮ হি.), আল-মানহাজুল ক্কাবীম ফি ইখতিছারি ‘ইক্কতিদ্বায়ুস্-সিরাতিল মুস্তাক্কীম।
21. ইবরাহিম ইবনু মুসা আশ-শাত্বিবী (৭৯০ হি.), আল-ই‘তিসাম।
22. ইবনু আবীল ইয (৭৯২ হি.), শরহুল আক্কীদাতুত্তাহাবীয়্যাহ।
23. নুরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭ হি.), মাজমাউয-যাওয়ায়িদ।
24. ইবনু হাজার আসক্কালানী (৮৫২ হি.), ফাতহুল বারী।
25. আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনি (৮৫৫ হি.), আল বিনায়াহ।
26. জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.), তাদরীবুর্রাবী।
27. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, জাম‘উল জাওয়ামি‘‘য়।
28. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল-জামি‘উল কবীর।
29. ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি.),আল-বাহরুর রায়িক্ক।
30. আলাউদ্দীন আলী ইবন হুসামুদ্দীন আল-মুত্তাক্কী (৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল।

31. আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (১০৮৮ হি.), আদ্দুর্রুল মুখতার।
32. ইবনু আবেদীন শামী (১১২৫ হি.), রাদ্দুল মুহতার।
33. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৭৬ হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ।
34. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্-শাওকানী (১২৫০ হি.) ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহ্ক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল।
35. আল্লামা আলুসী (১৩৪২ হি.), রুহুল মা'আনী।
36. খাইরুদ্দীন যিরিক্লী (১৩৯৬ হি.), আল-আ'লাম।
37. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪১৯হি.), সহীহ ওয়া দ'য়ীফলু জামি''য়স সাগীর।
38. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত্ তারহীব।
39. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসি-দ্ব'য়ীফাহ।
40. আলবানী, তিরমিযির সহীহ ও দ'য়ীফ।
41. মুফতী ফয়জুল্লাহ,(১৩৯৬ হি.), পান্দে নামাহ খাকী।
42. শামসুদ্দীন আফগানী (১৪২০ হি.), জুহুদু উলামায়িল হানাফিয়্যাহ ফি ইব্তালি আক্বায়িদিল ক্বুবুরিয়্যাহ।
43. মুফতী রশীদ আহমদ লুদয়ানবী(১৪২২ হি.), আহসানুল ফাতাওয়া।

44. বারি’ ইরফান তাওফিক্ব, সহীহু কুনুযিস্-সুন্নাতিন্-নাবাবিয়্যাহ।
45. আলী ইবন ইবরাহিম হুশাইশ, সিলসিলাতুল আহাদীসিল ওয়াহিয়াহ।
46. শায়খ আব্দুল্লাহ মুহসিন, আল ইমাম বুখারী ও কিতাবুহু আল-জামি‘উস সহীহ।
47. ড. মুহাম্মদ হুসাইন ইবন হাসান, মা‘আলিমুল উসূলিল ফিক্বহী ‘ইনদা আহলিস্-সুন্নাতি ওয়াল জামা‘আহ।
48. আব্দুর রহমান আল-খামিছ, ই‘তিক্বাদুল আয়িম্মাতিল আরবা‘আহ।
49. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির, হাদীসের নামে জালিয়াতী।
50. মৌলবী শামছুল হুদা, নেয়ামুল কুরআন।
51. আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ নাজমুল হক, মোকছুদুল মো’মিনীন বা বেহেশ্তের পুঞ্জী।
52. শাইখ আব্দুর রেজা মা‘আশ, মুনতাদাল কফিল ওয়েব।

সমাপ্ত

❁❁❁❁❁